রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে

২৮ জানুয়ারি ২০১৬, পাঁচ দফা দাবিতে ভয়-ভীতির বাঁধভাঙ্গা

কর্মচারী স্রোতের প্লাবন দেখল কলকাতা

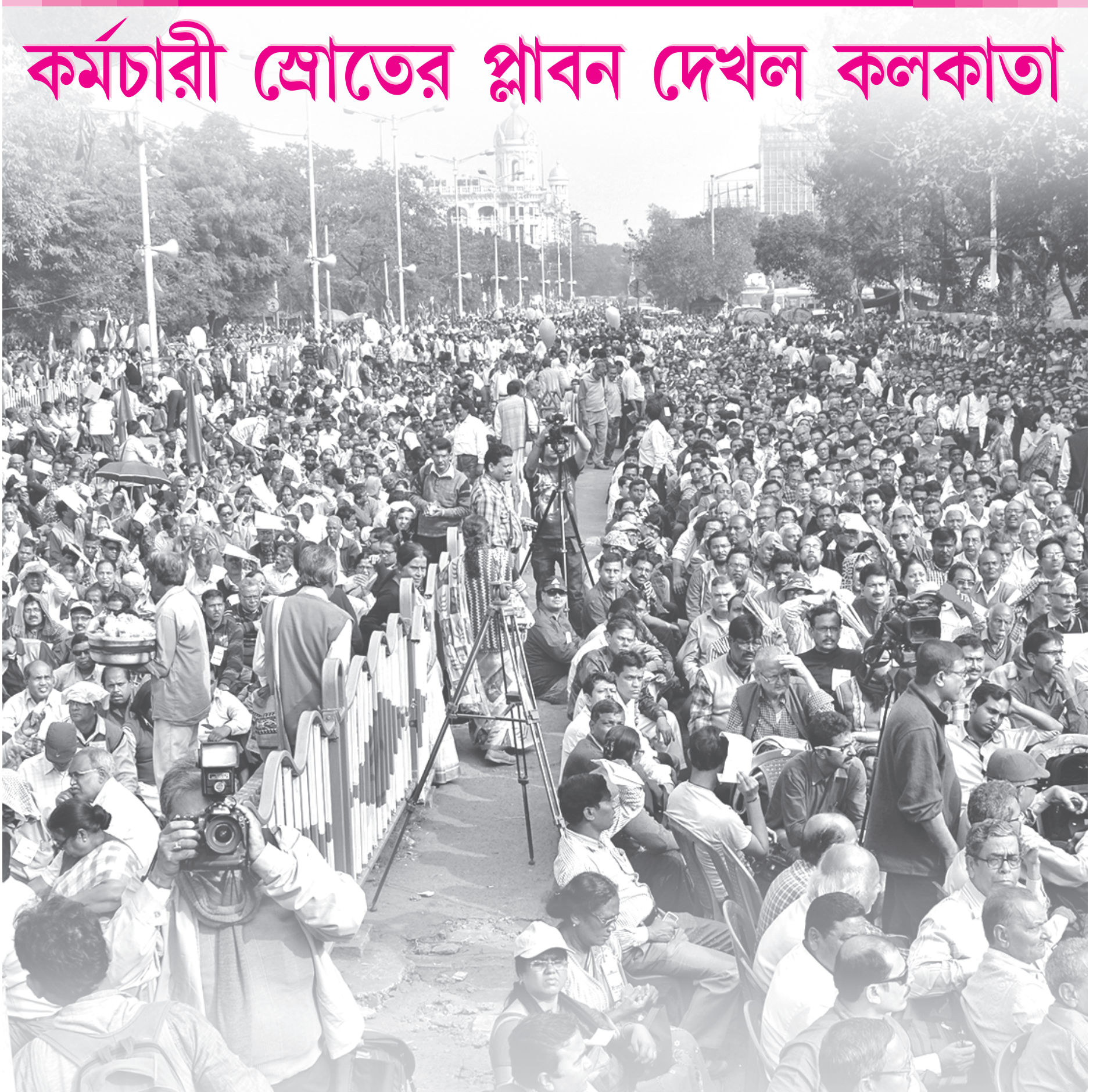

আক্ষরিক অর্থেই প্লাবন। বেলা ২টোয় সমাবেশের সময়। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই একের পর এক কর্মচারী মিছিলের স্রোত আছড়ে পড়তে শুরু করলো কলকাতার ধর্মতলায় রানী রাসমনি এভিনিউতে। যানবাহনের যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট চওড়া তিনলেনের রাস্তা এই রানী রাসমনি এভিনিউর অবস্থান রাজভবনের ঠিক বিপরীতে। রাজভবনের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে একেবারে বাঁদিকে যে লেনটি, তারই ওপর নির্মিত হয়েছিল প্রশস্ত একটি মঞ্চ। মঞ্চটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এমনভাবে বানানো হয়েছিল যেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ যৌথ মঞ্চের শরিক (যে যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে বিগত বছরে কনভেনশন, মিছিল ও ধর্মঘট হয়েছে) ৩৫টি সংগঠনের একজন করে নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি ঐ মঞ্চে আসন গ্রহণ করতে পারেন। উপর্যুপরি মিছিলের স্রোতে অচিরেই ভরে উঠলো প্রথম লেন। কিন্তু মিছিল তো থামেনি। আসছে আরও অনেক অনেক মিছিল। প্রতিটি মিছিলে পত পত করে উড়ছিল রক্তপতাকা। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। আবেগ, উদ্দীপনায় ভরপুর, স্লোগান মুখরিত, কিন্তু শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রতিটি মিছিল। প্রথম লেনে তখন 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরি' অবস্থা। শুধুমাত্র সুদূর উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলা থেকে আগত কর্মচারীরা ভরিয়ে দিয়েছেন প্রথম লেন। কেউ এসে পৌঁছেছেন আগের দিন রাতে, কেউ বা ঐদিনই কাকভোরে। বিশ্রাম হয়নি ভালো করে, নাকে-মুখে কোনোরকমে গুঁজে ছুটে এসেছেন মিছিলে। কিন্তু চোখে ক্লান্তির বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিয়ে এবারে মিছিল ঢুকতে শুরু করলো দ্বিতীয় লেনে। মঞ্চ থেকে তখন ঘোষণা করা হচ্ছে, 'এস. এন ব্যানার্জী রোড ধরে একটি সুবিশাল মিছিল আসছে...। মিছিলকে সভাস্থলে আসার সুযোগ করে দিন।' দেখতে দেখতে ভরে উঠল দ্বিতীয় লেনও। 'আরও মিছিল আসবে নাকি?'—জনৈক পুলিশ কর্মীর এই প্রশ্নের উত্তরে একজন স্বেচ্ছাসেবক যখন বিশেষ জোর দিয়ে বলছেন, 'নিশ্চিয়ই', ততক্ষণে গঙ্গা ও মোহনবাগান মাঠের দিক থেকে তৃতীয় লেনে ঢুকতে শুরু করেছে মিছিল। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টীম বেলা ২.০৫ মিনিটে যখন উদ্বোধনী গণসঙ্গীত শুরু করল, তখন মঞ্চের ওপর থেকে চোখে পড়ছে তিন লেন ছাপিয়ে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের থিক্ থিক্ ভীড়। আরও একবার ইতিহাস তৈরি করলো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। □

(বিস্তারিত সংবাদ চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পৃষ্ঠায়)

সংগ্রামী হাতিয়ার
জানুয়ারি ২০১৬
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪তম বর্ষ □ নবম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

সাক্ষী থাকল কলকাতা
অধিকার রক্ষার লড়াই কাকে বলে

অনুমান করা গিয়েছিল আগেই। ২৮ জানুয়ারি কলকাতার রাজপথ প্লাবিত হবে কর্মচারী স্রোতে—এই প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণা পত্রিকার ডিসেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই ব্যক্ত করা হয়েছিল। গত ২৯ ডিসেম্বর প্রতিটি জেলার সদরে এবং কলকাতার ৭টি অঞ্চলে সংগঠনের আহ্বানে যে কর্মচারী সমাবেশ হয়েছিল, সেগুলিতে হাজার হাজার কর্মচারীর উদ্দীপনাময় উপস্থিতিই এই প্রত্যয় তৈরি করেছিল—কলকাতার ২৮ জানুয়ারির কেন্দ্রীয় সমাবেশ এক ঐতিহাসিক চেহারা পরিগ্রহ করতে চলেছে। কিন্তু ২৮ জানুয়ারি মধ্যাহ্নে আমরা যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা হল প্রত্যাশাকে, অনুমানকে ছাপিয়ে যাওয়া কর্মচারী প্লাবন। বহু ঐতিহাসিক লড়াই-এর স্রষ্টা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রমাণ করলো—ইতিহাস নির্মাণে তার নৈপুণ্য সময়ের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও আজও অটুট রয়েছে। রাজ্য কর্মচারীদের ভরসার অপর নাম রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি—প্রায় ছ'দশক আগে অর্জিত এই শিরোপা, এখনও স্থানচ্যুত হয়নি। আর হবেই বা কেন? একটি সংগঠনের কার্যকারিতা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর—(১) অনুগামী সমাজের স্বার্থ রক্ষায় দায়বদ্ধতা, (২) পরিস্থিতি উপযোগী সংগ্রাম-আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণে পারদর্শিতা, (৩) ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবিগুলি নির্বাচনের দক্ষতা, (৪) এগুলিকে নিয়োগ কর্তার সামনে উপযুক্ত যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করার মুন্সিয়ানা, (৫) ধৈর্য সহকারে প্রতিটি অধিকার ও দাবি অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া, (৬) অর্জিত অধিকার রক্ষায় সচেতন-সতর্কতা, (৭) নিয়োগ কর্তা বা শাসকের রাজনৈতিক রং না দেখে, তার কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন, (৮) অধিকার সচেতনতার পাশাপাশি কর্তব্যপরায়ণতাকেও সমগুরুত্ব প্রদান, (৯) শুধুমাত্র আর্থিক দাবি-দাওয়ার ঘেরাটোপে আবদ্ধ না থেকে, বৃহত্তর সমাজে ঘটমান বিভিন্ন ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মূল্যায়ন এবং (১০) সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও তাঁদের লড়াইয়ে সাথী হওয়ার সঙ্কল্প—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অভ্যন্তরে অন্যতম চ্যাম্পিয়ন সংগঠন—বিদ্যমান মহীরুহপ্রতিম কাঠামোই তার বড় প্রমাণ। পথ চলা শুরু হয়েছিল ৯টি সংগঠনকে একটি মঞ্চে শামিল করে। আজ ছ'দশক পরে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩। পঞ্চায়েত স্তরে কর্মরত কর্মচারীদের সংগঠনগুলি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের লক্ষাধিক সদস্য বিশিষ্ট সংগঠন, বিভিন্ন বোর্ড-কর্পোরেশন সংস্থাগুলিতে কর্মরত কর্মচারীদের সংগঠনগুলি যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পাশে রয়েছে, তা কি এমনি এমনি? বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে, কর্মসূচী ভিত্তিক বহু সংগঠন যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাথে যৌথ আন্দোলনে শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে, তাও কি এমনি এমনি? না, তা নয়।

যে কোনো পরিস্থিতিতিকেই ভেদ করে অগ্রসর হওয়ার দক্ষতাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন তথা শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। একদিকে সংগঠন যখন কর্মচারীদের অভ্যন্তরে প্রবল আস্থা অর্জন করেছে, তখন অপরদিকে একাধিকবার নিষ্ঠুর-হিংস্র শাসকের আক্রমণের লক্ষ্যস্থলও হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে সারা রাজ্য জুড়ে যখন ভয়াবহ আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস, তখন বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে সাথে আক্রান্ত-রক্তাক্ত হতে হয়েছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকেও। আজ আবার এ রাজ্যে ঘোর অমানিশা, স্বৈরাচারী শাসকের রক্তচক্ষু-হুমকি আর আক্রমণ ধেয়ে আসছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে, আমাদের দিকেও; সংগঠনকে দুর্বল করার জন্য শাসকের তূণ থেকে বেরিয়েছে একাধিক অস্ত্রও; আর্থিক বঞ্চনা, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে সঙ্কুচিত করা, ধর্মঘটের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া, বাছাই করে দূর দূরান্তে বদলি, সাধারণ ডেপুটেশন দেওয়ার অপরাধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার—এগুলো তো রয়েছেই। পাশাপাশি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার অশ্রুতপূর্ব হুমকিও শোনা গেছে।

বাকি সব আক্রমণগুলি সম্পর্কে পূর্ব-অভিজ্ঞতা সংগঠনের ছিল। সত্তর-দশকের স্বৈরশাসক ঐ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ সংগঠনকে করে দিয়েছিলেন। মাঝে প্রায় সাড়ে তিন দশক সময় পর্বে প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীদের প্রজন্মান্তর ঘটে গেছে। সত্তর-দশকের আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মচারী স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান সময়ে নেই। কিন্তু তাঁদের লিপিবদ্ধ করা ইতিহাস রয়েছে। এখনও যাঁরা জীবিত এবং কিছুটা হলেও কর্মক্ষম, তাঁরা প্রয়োজনে তাঁদের অভিজ্ঞতার ঝুলি আমাদের সামনে উপুড় করে দেন এবং দিচ্ছেনও। ফলে ঐ আক্রমণগুলিকে মোকাবিলা করার রসদ আমাদের তৈরি করাই ছিল। শুধু আমাদের যা বিস্মিত করেছিল (আতঙ্কিত নয়) তা হল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একজন সর্বোচ্চ স্তরের প্রশাসক, কিভাবে প্রশাসনের অভ্যন্তরের একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনকে ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিতে পারেন! কিন্তু বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমরা চুপ করে বসেছিলাম তা কিন্তু নয়। তৎক্ষণাৎ জোরদার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল সারা রাজ্যে। শুধু আমাদের তরফ থেকেই নয়, আমরা গর্বিত, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমস্ত অংশ থেকেই উঠে এসেছিল জোরালো প্রতিবাদ।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে একথা বলা যেতে পারে ২৮ জানুয়ারি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সমাবেশের বিপুল সাফল্য, কোনো তাৎক্ষণিক উদ্যোগের ফসল নয়। ২০১১-র বিধানসভার নির্বাচন পরবর্তীতে প্রশাসনের রাজনৈতিক চরিত্রের নেতিবাচক পরিবর্তন চলার পথে প্রতিকূলতার যে প্রস্তরখণ্ডগুলিকে বিছিয়ে দিয়েছে, সেগুলিকে অতিক্রম করার জন্য ধারাবাহিক পরিস্থিতি উপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ করার দক্ষতাই এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মূলভিত্তি। আরও একটি কারণ উল্লেখযোগ্য। তা হল, সমস্ত কর্মসূচীতেই যতদূর সম্ভব আবিষ্ট করা হয়েছে কর্মচারীবন্ধুদের। শুধুমাত্র 'গ্যালারি শো'-এর জন্য কর্মসূচী গ্রহণের লক্ষ্যে 'অ্যাডভেঞ্চারিসম্'-এর সহজ পথ বেছে নেওয়া হয়নি। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মচারীবন্ধুদের মধ্যে যে সমস্ত দাবিগুলি বিশেষ চর্চার বিষয় হয়েছে, সহজাত দক্ষতায় সেগুলিকে নির্বাচন করে সংগঠনে দাবি সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচীর 'ফর্ম'-এর দিক থেকেও বাস্তবতা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু কর্মসূচীর কেন্দ্রে থাকেন কর্মচারীরা, তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির অভিঘাতে তাঁদের মানসিক স্তরে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তাকে উপেক্ষা করা হয়নি। বাইরে থেকে জোর করে কোনো কর্মসূচী চাপিয়ে দেওয়া নয়, কর্মচারীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে তাঁদের আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়ে, তাঁদের ধাতস্থ করে নিয়ে, মনে সাহসের সঞ্চার ঘটিয়ে কর্মসূচীর 'ফর্ম'-এর বিকাশ ঘটানো হয়েছে। অ্যাজিটেশন-প্রোপাগান্ডার সমস্ত 'ফর্ম'-কেই ব্যবহার করা হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। ধর্মঘট সহ চিরাচরিত কর্মসূচী তো ছিলই, উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যবহার করে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন 'ফর্ম'। প্রশাসনিক আক্রমণ ও আর্থিক বঞ্চনার শিকার কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ যেমন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, সমানুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচার ও কর্মসূচীর ঘনত্ব। কর্মচারী স্বার্থ সম্পর্কে কার্যত মূক ও বধির একটি সরকারের কাছে বারবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কর্মচারীদের দাবিগুলিকে। আবার শুধুমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এককভাবে এই উদ্যোগ জারি রেখেছে তা নয়। অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী প্রতিটি সংগঠনও একই লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। এমনকি যাঁদের সাথে কোনো না কোনো কারণে কিছুটা দূরত্ব ছিল, সেই দূরত্বও ঘুচিয়ে ফেলে এক মঞ্চে শামিল করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি এতগুলি সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের মতো 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর কর্মসূচী সফলভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এই সময়কালেই।

এইসব কিছুর মধ্য দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারী বন্ধুরাও উপলব্ধি করেছেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি শুধুমাত্র অনুকূল সময়ে একের পর এক দাবি আদায়ের চ্যাম্পিয়ন সংগঠন নয়, প্রতিকূলতার মধ্যে অর্জিত অধিকার রক্ষার অকুতোভয় লড়াইয়েও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এই উপলব্ধিই যে প্রগাঢ় আস্থার জন্ম দিয়েছে, তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন ঘটল ২৮ জানুয়ারি রানী রাসমনি এভিনিউতে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ২৮ জানুয়ারি একটি মাইল ফলককে অতিক্রম করা হল মাত্র। যেতে হবে আরও বেশ কিছুটা পথ। দমবন্ধ করা এই পরিস্থিতিতে মরিয়া লড়াইয়ের জঙ্গীরূপ যে আত্মপ্রত্যয়ের জন্ম দিল, তাকে পুঁজি করেই বৃহত্তর লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত হব আমরা। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ব্যাতিরেকে বিশ্রাম নেই আমাদের বীর যোদ্ধাদের। তাই, 'সামনে দিন, জোর লড়াই, জোট বাঁধো তৈরি হও?' □

২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

দলিত হওয়ার মাশুল প্রাণের বিনিময়ে দিল রোহিত ভেমুলা

হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে পি এইচ ডি করছিল রোহিত ভেমুলা। বুকে ছিল এক রাশ স্বপ্ন। স্বপ্ন ছিল গবেষণা করে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করার। ভরসা ছিল দেশের সংবিধানে, ভরসা রেখেছিল দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপর। কিন্তু সে হয়তো ভুল স্বপ্নই দেখেছিল। কারণ রোহিত যে ছিল দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। যে সম্প্রদায়ের মানুষ এখনও, স্বাধীনতার প্রায় ৫৯ বছর পরও সমানাধিকার পায় না। এখনও যাঁদের উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারা নানা সামাজিক নিপীড়নের শিকার হতে হয়। রোহিত হয়তো স্বপ্নের ঘোরে ভুলে গেছিল যে এদেশের ২১ শতাংশ দলিত পরিবার এখনও খড় ও বাঁশের ঘরে থাকে। ৬৫ শতাংশ দলিত পরিবারের বাড়িতে পানীয় জলের উৎস নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ এখনও পৌঁছায়নি ৪১ শতাংশ পরিবারের কাছে। শৌচালয় নেই ৬৫ শতাংশ পরিবারের। এইরকম অবস্থায় রোহিতের স্বপ্ন দেখা তো অপরাধ। ছোটবেলা থেকে দলিত বলে নানা গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করে দাঁতে দাঁত চেপে এতদূর পথ হেঁটেছিল রোহিত ভেমুলা। হয়তো ভেবেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় তার শুধুই দলিত পরিচিতি সত্তাই থাকবে না, আরও অনেক সত্তা এখানে গুরুত্ব পাবে। ভুলই ভেবেছিল সে। যখন অনুভব করল তখন আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে হল। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে উমা আন্না নামে একজনের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে রোহিত ভেমুলা। রেখে গেছে একটি সুইসাইড নোট।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েক মাস আগে। গত বছরের আগস্ট মাসে ইয়াকুব মেননের ফাঁসির বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছিল ওই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্যোক্তা ছিল 'আম্বেদকর স্টুডেন্টস ইউনিয়ন'। রোহিত ছিল ওই ইউনিয়নের একজন সক্রিয় সদস্য। এই আন্দোলনের একটা প্রেক্ষাপট ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার যখন ফৌজদারি আইন (ক্রিমিনাল অ্যাক্ট) সংশোধন করে অপরাধীদের ফাঁসী দেওয়ার ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে উদ্যোগী হয় তখন থেকেই রোহিতরা রাস্তায় নামে। সেই পরিপ্রেক্ষিতিতেই ওই মিছিল ছিল। ওই মিছিলকে কেন্দ্র করে সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এ বি ভি পি-র সাথে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের সংঘর্ষ হয়। এ বি ভি পি-র এক স্থানীয় নেতাকে মারধরের মিথ্যা অভিযোগ ওঠে রোহিতসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে। এরপরই সাসপেন্ড করা হয় রোহিতসহ পাঁচজন সদস্যকে। এই ঘটনার তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি প্রাথমিক তদন্তে রোহিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ পায় নি। তাই তাদের উপর থেকে সাসপেনশন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আবার ডিসেম্বর মাসে রোহিতদের নতুন

করে সাসপেন্ড করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় ক্লাসরুম, গবেষণাগার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন, হস্টেল ইত্যাদি কোনো কিছুই ব্যবহারের সুবিধা তারা পাবে না। এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রোহিত সহ ৫ ছাত্র হোস্টেলের সামনে তাঁবু খাটিয়ে থাকছিলেন। এই বিষয়টিও সহ্য হয় নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। ২১ ডিসেম্বর সেই তাঁবুও ভেঙে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও তারা থাকতে পারবে না। কর্তৃপক্ষের এই নির্যাতনে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে রোহিত। শেষে ১৭ জানুয়ারি ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা, আত্মহত্যা করে রোহিত।

আগস্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই মিছিলের পর থেকেই এ বি ভি পি এবং কেন্দ্রীয় শ্রমপ্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ বঙ্গারু দত্তাত্রেয় উঠে পড়ে লেগেছিলেন কী করে ওই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যায়। ১৭ আগস্ট শ্রমমন্ত্রী মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে। তা সত্ত্বেও রোহিতদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ না মেলায় ডিসেম্বর মাসে তাদের ফের সাসপেন্ড করে মানসিক নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে কর্তৃপক্ষ। আত্মহত্যার আগে বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে রোহিত জানিয়েছে, তার ফেলোশিপের ৭ মাসের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বাকি রেখে দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সমস্ত ঘটনার পর্যবেক্ষণে এটাই প্রমাণ হয় কেন্দ্রীয় শ্রমপ্রতিমন্ত্রী বঙ্গারু দত্তাত্রেয় ও মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর চাপেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রোহিত সহ ৫ ছাত্রের উপর এই অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে।

কিসের এত চাপ? আদতে এই চাপ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়। চাপ সৃষ্টি করেছিল আর এস এস-বি জে পি। হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ছাত্র সংগঠন আছে। একটি হল সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন 'অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ' বা এ বি ভি পি। আরেকটি হল 'আম্বেদকর স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন', রোহিত যে সংগঠনের সদস্য। এই সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারের গোমাংস নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন করেছে। ২০১৩-র আগস্ট-সেপ্টেম্বরে যখন মুজফ্ফরনগরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘর্ষ হয়, তখন এই ছাত্র সংগঠন তার বিরুদ্ধে সোচ্চায় হয় এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন করে। আর এস এস-বি জে পি দলিত ছাত্রদের উগ্র 'হিন্দুত্ব' বিরোধী কোনো ভূমিকা মেনে নিতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর নীতির সমালোচনা করে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানানোর অপরাধে আই আই টি মাদ্রাসের আম্বেদকর কেরিয়ার স্টাডি সার্কেল (এ কে এস সি)-কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বাস্তব হল এই যে সংঘ পরিবার ছাত্রদের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, বামপন্থী যে কোনো কার্যকলাপের বিরোধী। দলিত ছাত্রদের ক্ষেত্রে তো তারা খড়্গহস্ত। এই কারণে বিগত ১০ বছরে রোহিতের বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৮ জন আত্মহত্যা করেছে।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর থেকেই দেশ জুড়ে দলিতদের উপর নির্যাতন, হিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া তথ্যই বলছে, ২০১৪ সালে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে পরবর্তী সময়ে দলিতদের উপর হিংসা ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কালে সঙ্ঘ নেতা মোহন ভাগবত কিংবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি কে সিং-এর দলিত বিরোধী মন্তব্য দেশবাসী শুনেছে। মনুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী সঙ্ঘ পরিবার এবং বি জে পি যে দলিতদের বিরুদ্ধে নির্যাতনে মদত দেবে, প্ররোচনা দেবে সেটাই স্বাভাবিক।

▶ *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে)*

সপ্তম বেতন কমিশনের প্রতিবেদন

কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় প্রতি দশ বছর অন্তর, তার বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য বেতন কমিশন গঠন করে। ঠিক একইভাবে ইউ পি এ সরকারও ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার আগেই সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছিল এবং কমিশন ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার প্রস্তাবসহ তাদের রিপোর্ট ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। যদিও সম্পূর্ণ রিপোর্টের সুনির্দিষ্ট ফলাফল সম্পর্কে আরও বিশদ পর্যালোচনা প্রয়োজন, কিন্তু এখনই কয়েকটি বিষয় বেশ স্পষ্ট।

বেতন বৃদ্ধির হারের সঙ্কোচন

প্রথমত, সপ্তম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির হারে কড়া সঙ্কোচনের দাওয়াই চাপিয়ে দিয়েছে। এমনকি এই বিষয়ে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে আর কোনো বেতন কমিশন এতখানি কৃপণতার পরিচয় দিতে পারেনি। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সাথে তুলনামূলক হালকা আলোচনা করলেই সঙ্কোচনের মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতা পরিষ্কার নজরে আসে।

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬-এর মধ্যে, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মধ্যবর্তী সময়ে, শিল্প শ্রমিকদের জন্য সরকার অনুমোদিত ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৭৩ শতাংশ। অথচ ঐ একই সূচক অনুযায়ী ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬-র মধ্যবর্তী সময়ে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাব্য হার ১২০ শতাংশ। অর্থাৎ সপ্তম বেতন কমিশনকে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অনেক বেশি বেতন ক্ষয়ের প্রসঙ্গটিকে বিবেচনায় রাখতে হয়েছিল (এবং মহার্ঘভাতা প্রদান সত্ত্বেও বেতনের এই ক্ষয় ঘটে)।

যেহেতু ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৫-১৬-এর মধ্যবর্তী পর্বে সরকারী ক্ষেত্রে বেতন খাতে খরচের পরিমাণ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আনুপাতিক হার কমেনি বরং বেড়েছে, স্বভাবতই বর্ধিত মুদ্রাস্ফীতির হারকে বিবেচনায় রেখে, সপ্তম বেতন কমিশন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের তুলনায় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বেতনের অংশকে আরও বেশি বৃদ্ধি করবে—এটাই ছিল স্বাভাবিক ও সঙ্গত প্রত্যাশা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক বিপরীত। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনখাতে খরচ ও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েছিল .৭৭ শতাংশ। অথচ সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বৃদ্ধির এই হার .৬৫ শতাংশ। এমনকি ঐ সময়ের তুলনায় এখন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জি ডি পি-র হার হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটলো।

এক কথায় বলতে হলে বলা যায়, বেতন কমিশন লগ্নী-পুঁজির 'ব্যয় সঙ্কোচনের' তত্ত্বকেই সবিশেষ মর্যাদা দিয়েছে এবং নয়া উদারবাদী অর্থনীতির এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষতি করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হল, উচ্চতর বেতনভুক কর্মচারীদের তুলনায় নিম্নতর বেতনভুক কর্মচারীদের প্রতি বেতন কমিশন অনেক বেশি নির্দয় আচরণ করেছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের ফারাক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে যায়। পূর্বতন সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৮০,০০০ টাকা, যা বৃদ্ধি করে ২.২৫ লক্ষ টাকা করার কথা বলা হয়েছে (ক্যাবিনেট সচিবদের জন্য প্রস্তাবিত ২.৫ লক্ষ টাকার বিষয়টি আমরা ধরছি না)। অপরদিকে পূর্বতন সর্বনিম্ন বেতন ছিল ৬,৬০০ টাকা যা বৃদ্ধি করে ১৮,০০০ টাকা করা হয়েছে। এইভাবে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত পূর্বের ১২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১২.৫ শতাংশ করা হয়েছে। ১২.৫ শতাংশ ফারাক পরিমাণের দিক থেকে বিপুল তো বটেই, পাশাপাশি ফারাক পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করার বিষয়টি একটি দমনমূলক পদক্ষেপ।

কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কাঠামোর মধ্যে এই বৈষম্যের বিষয়টি আরও এক দিক থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্যক্তিভিত্তিক হিসেব করলে দেখা যাবে, বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগে একজন নিম্নতম বেতনভূক কর্মচারীর সমস্ত ধরনের ভাতাসহ সর্বমোট বেতন ছিল প্রতি মাসে ১৫,৭৫০ টাকা। ঐ ব্যক্তি এখন মাসে ১৮,০০০ টাকা বেতন পাবেন, যার অর্থ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৪ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বমোট বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে খরচ বৃদ্ধি পাবে প্রায় ২৩.৫৫ শতাংশ, যার মধ্যে শুধুমাত্র পেনশন খাতে বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪ শতাংশ। এর অর্থ হল বেতন-ভাতা খাতেও সামগ্রিক বৃদ্ধির পরিমাণ ২৪ শতাংশ। সুতরাং তুলনামূলক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে একথা বলাই যায় নিম্নতম বেতনভুক কর্মচারীদের ১৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি পরিমাণগত দিক থেকে খুবই সামান্য। আরও একটি সিদ্ধান্তে এর ভিত্তিতে পৌঁছনো যায়, কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যয় সঙ্কোচনের নীতিকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে, তাতে অপরাপর অংশের তুলনায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নিম্নতম স্তরের কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা।

এই দুই ধরনের প্রবণতা, একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সঙ্কোচন (যার প্রভাব রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও পড়বে, কারণ রাজ্য সরকার সাধারণভাবে

ডঃ প্রভাত পট্টনায়েক

কেন্দ্রীয় বেতন কাঠামোর সাথে সাযুজ্য রেখেই তার কর্মচারীদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ করে) এবং অপরদিকে বেতন কাঠামোর মধ্যেই ফারাক বা বৈষম্য বৃদ্ধি—নয়া উদারবাদী অর্থনীতিই যুক্তি মেনে করা হয়েছে। একে প্রতিহত করতে না পারলে ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উদারবাদী অর্থনীতির প্রভাব

কারণটি খুবই সাধারণ। উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার আগে, বেসরকারী ক্ষেত্রের আধিকারিক স্তরে বেতন-ভাতা নির্ধারণের সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকত। এই নিয়ন্ত্রণ যে শুধুমাত্র কর-আরোপ করেই করা হত তা নয়, সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ চাপও সৃষ্টি করা হত। ঐ সময়ে একটি বিশেষ স্তরের ঊর্ধ্বে বেতন-ভাতার ওপর এমনকি ১০০ শতাংশ বা তারও বেশি কর আরোপ করা হত। নয়া উদারবাদী মহলের কাছে পূর্বতন 'অবিবেচক' ব্যবস্থা সম্পর্কে এটা ছিল একটা উপহাসের বিষয় (কি করে তুমি ১০০ শতাংশের বেশি প্রান্তীয় কর আরোপ করা)! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এর লক্ষ্য ছিল আয়ের ঊর্ধ্বসীমা নিরূপণ, যাতে কর প্রদান করে হাতে যা থাকবে তা যেন একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম না করে। কোনো সন্দেহ নেই যে এই কারণে 'কর ফাঁকি' দেওয়ার প্রবণতা দারুণভাবে কাজ করত এবং আয়ে কালো টাকার অঙ্কও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু সরকারীভাবে অন্তত উচ্চ আয় নিয়ন্ত্রণের একটা প্রচেষ্টা ছিল।

অপরদিকে কর ব্যবস্থার বাইরে, FERA (বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন) আইন অনুযায়ী সরকার কর্পোরেট সেক্টরের ওপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করতো, আধিকারিকদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণের জন্য। যদিও সন্দেহ নেই যে, বেতনের এই বেড়াজালকে বিভিন্ন ধরনের উপঢৌকনের সাহায্যে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হত, কিন্তু তারও একটা সীমা ছিল। কারণ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ। নয়া উদারবাদের সাথে সাথে এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণ উবে গেছে।

সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ প্রকাশিত হয়, কিভাবে আই আই টি বা আই আই এম থেকে সদ্য স্নাতক হয়ে অনেকেই বাৎসরিক ২ কোটি টাকা (মাসিক ১৭ লক্ষ টাকা) বা তারও বেশি বেতনের চাকরির সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। এই পরিমাণ বেতন ক্যাবিনেট সচিব পদে কর্মরত সর্বোচ্চ বেতন প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর বেতনের থেকে প্রায় ৭ গুণ বেশি। স্বভাবতই আই আই টি বা আই আই এম থেকে সদ্য উত্তীর্ণ একজন স্নাতকের বরিষ্ঠতম সরকারী কর্মচারীর তুলনায় ৭ গুন বেশি বেতন পাওয়ার বিষয়টি বেতন কাঠামোর অসঙ্গতিকেই প্রকাশ করে। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের সচিব পর্যায়ে এই ধরনের বেতন বৈষম্য হয় দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে (বেতনের ফারাকটিকে পুষিয়ে নেওয়ার জন্য), না হয় ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকে ঠেলে দেবে (যেখানে ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আত্মজাহির করার বিনিময়ে পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়) অথবা সরকারী ক্ষেত্র থেকে বেসরকারী ক্ষেত্র অভিমুখে 'মেধা'র প্রবাহ ঘটবে।

স্বাস্থ্যের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই মেধার নিষ্ক্রমণ ঘটতে শুরু করেছে। সরকারী ক্ষেত্রের ডাক্তারদের, এমনকি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এর মতো প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানেও, যে বেতন দেওয়া হয় তার পরিমাণ বেসরকারী স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বেতনের ভগ্নাংশ মাত্র। যদিও এর জন্য যে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকেরা দলে দলে সরকারী ক্ষেত্র ছেড়ে বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত হয়ে পড়েছেন তা নয়। কিন্তু মেধার নিষ্ক্রমণ সরকারী ক্ষেত্র থেকে বেসরকারী ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটেনি তাও বলা যাবেনা। যদি এই ধরনের প্রখ্যাত সরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধার প্রস্থান ঘটে, তাহলে দেশের অনুন্নত এলাকায় সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল সহজেই অনুমেয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান, অন্তত মানুষের ধারণায়, দক্ষ চিকিৎসকের ঘাটতি থাকার ফলে, কার্যকরী পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই রোগীরাও, এমনকি বিপুল খরচের ধাক্কা সামলাতে হবে জেনেও, বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকেই ঝুঁকছেন এবং বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষকে কার্যত লুট করে ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের ধরে রাখার জন্য, তাঁদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির পথে এগোবে, এটা স্বাভাবিক। এমনকি সপ্তম বেতন কমিশনের 'টার্মস অফ রেফারেন্স'-এ উচ্চপদে কর্মরত সরকারী আধিকারিকদের ধরে রাখার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। না হলে তাঁরা বেসরকারী ক্ষেত্রের দিকে চলে যেতে পারেন। কিন্তু, যদিও সরকার কোনোভাবেই বেতন প্রদানের দিক থেকে বেসরকারী ক্ষেত্রের সাথে এঁটে উঠতে পারবে না, তবুও যে সমস্ত আধিকারিকের দিকে বেসরকারী ক্ষেত্রের লোভনীয় হাতছানি রয়েছে, তাঁদের ধরে রাখার চেষ্টার ফলে সরকারের নিজস্ব বেতন কাঠামোর মধ্যেই বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

বেসরকারী ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈষম্য আগে থেকেই রয়েছে, যেখানে একটা ক্ষুদ্র অংশ কোটি কোটি টাকা বেতন পায়, আর বাকিদের জোটে নামমাত্র। নয়া উদারবাদ তার এই দর্শনকে সরকারী ক্ষেত্রের অভ্যন্তরেও চালু করতে চায় এবং ফলত সামগ্রিক বেতন সঙ্কোচন। এর কারণ হল, উপর তলার আধিকারিকদের এই ভাবে ধরে রাখার প্রচেষ্টার ফলে সরকারী কোষাগারে বিপুল চাপ সৃষ্টি হয়, অথচ নয়া উদারবাদী দর্শন এফ আর বি এম-এর মাধ্যমে এবং কর্পোরেট পুঁজির হাতে উপঢৌকন তুলে দেবার স্বার্থে সরকারকে ব্যয় সঙ্কোচ করতে বলে। এই বিষয়টি উত্থাপন করা হল মানে এটা নয় যে উচ্চপদে আসীন সরকারী আধিকারিকদের বেসরকারী ক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা রোখার জন্য সরকারের উচিত তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করা অথবা সপ্তম বেতন কমিশন যা বলেছে, তার কোনো বিকল্প নেই ইত্যাদি যুক্তিগুলি যথার্থ। বিষয়টি উত্থাপন করা হল এটা বোঝানোর জন্য যে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি তার চলার পথে যা চায় তা হল সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন এবং অসাম্য। এই দুটি নয়া উদারবাদী বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিরোধ করা দরকার।

বেসরকারী ক্ষেত্রের বেতন যা অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌঁছেছে এবং যা গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বেমানান, তাতে লাগাম পরানো এই প্রতিরোধের অন্যতম শর্ত। এই বিপুল পরিমাণ বেতন আসলে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের অংশ এবং যা পুঁজিপতিরা তাদের উচ্চপদে আসীন কর্মাধক্ষদের সাথে ভাগ করে নেয়। উচ্চ বেতনে লাগাম পরানোর আগে যা করা দরকার তা হল, শুরুতে কর পরিমাণ বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্তের বিপুল আকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দুনিয়াও এখন এই বর্ধমান অসাম্যের বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত, টমাস পিকেটির বইকে ঘিরে গুঞ্জনই যার বড় প্রমাণ। এমনকি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ধনী দেশগুলির দাভোস শীর্ষ বৈঠকেও অসাম্যের বিষয়টিকেই বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটাই সঠিক সময় যখন এই বিষয়ে জনমত গড়ে তোলা জরুরি। □

(মূল লেখাটি পিপলস্ ডেমোক্রেসি পত্রিকার ২৩-২৯ নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে তার সম্পূর্ণ অনুবাদ বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে প্রকাশ করা হল। অনুবাদ করেছেন সুমিত ভট্টাচার্য।)

আলোচনা সভা

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ মালদা জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বিষয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিক্ষা শিবিরের বক্তা ছিলেন রতন ভাস্কর, যুগ্ম আহ্বায়ক, জেলা ১২ই জুলাই কমিটি। সভা পরিচালনা করেন সুজিত চ্যাটার্জী। সভায় ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। □

গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৫ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা হাওড়া মেডিকেল ক্লাব হলে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার বিষয় ছিল 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের করণীয়'। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সংগঠনের সভানেত্রী দিপালী পোড়েল। আলোচনা সভার শুরুতে জেলা সম্পাদক অসিত দাস আলোচনা সভার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। উক্ত আলোচনা সভার মূল আলোচক ও একমাত্র বক্তা ছিলেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক জিয়াউল হক। তিনি তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যেমন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও আন্দোলনের জন্য ধারাবাহিক লড়াইয়ের আহ্বান জানান, তেমনি জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবং আমাদের রাজ্যে বিগত সাড়ে চার বছরে অধিক সময় ধরে দুর্নীতি, ধর্ষণ, খুন, বেআইনী বদলী, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণসহ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখসহ ৫৪ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, ষষ্ঠ পে কমিশনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে সর্বস্তরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। এই আলোচনা সভায় শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

বিক্ষোভ কর্মসূচী

অরণ্য সেক্টরের অভ্যন্তরে Joint Administrative Building-এ সংগঠনের কয়েকটি বোর্ড আছে। সেই বোর্ডগুলিতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতির পোস্টার লাগানো ছিল। গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে পি এন্ড আর ডি দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি মহাশয়ের আদেশবলে পোস্টারগুলিকে ছেঁড়া হয় এবং বোর্ডটিকে সরানো হয়। এই ঘটনা প্রথমবার নয়, পূর্বেও মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর আদেশ মতো অনুরূপ ঘটনা হয়েছিল। সেদিনও সমস্ত কর্মচারীরা বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন। উক্ত দিনে বিক্ষোভ ও স্লোগান দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষ সংগঠনের বক্তব্য মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং বোর্ডগুলিকে পূর্বের জায়গায় লাগানো হয়। বিক্ষোভ সভায় আনুমানিক ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক কল্যাণ রক্ষিত বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দসহ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আশীষ ভট্টাচার্য। সভার পর স্লোগানের মাধ্যমে পুনরায় পোস্টার লাগানো হয়। □

কর্মচারী স্রোতের প্লাবন দেখল কলকাতা

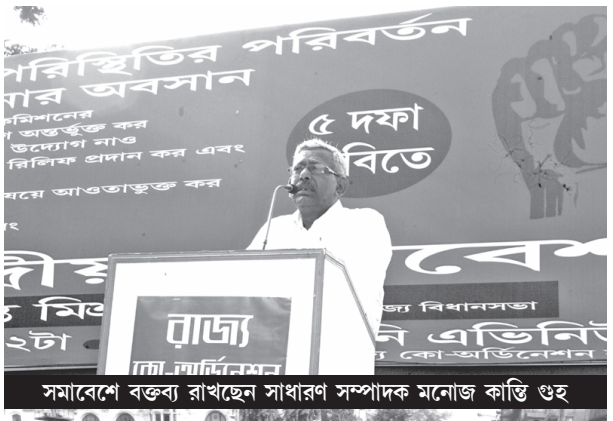

সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ে পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা, মূল বেতনের ২৫ শতাংশ (ন্যূনতম ২০০০ টাকা) ইন্টারিম রিলিফ প্রদান করা, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সম্পূর্ণ প্রদান করা, চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ে আওতাভুক্ত করা, নীতিহীন ও প্রতিহিংসামূলক বদলি রদ করা, ধর্মঘট সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার পাঁচ দফা দাবিতে ২৮ জানুয়ারি ২০১৬, পাহাড় থেকে সাগর, দশ সহস্রাধিক কর্মচারী স্রোতের প্লাবন দেখল কলকাতা মহানগরী। দীর্ঘ আর্থিক বঞ্চনা, প্রতিনিয়ত আক্রমণ, প্রতিহিংসামূলক হয়রানির শিকার সরকারী কর্মচারীরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে তাঁদের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বর্তমান রাজ্য সরকারের প্রতি। এই সুবিশাল সমাবেশে বেলা একটা থেকেই ধর্মতলার রানী রাসমনী রোডের দখল নিতে থাকে লাল নিশান, স্লোগান আর ফেস্টুন হাতে মিছিল। প্রথমেই শিয়ালদহ থেকে এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে এক সুবিশাল সুশৃঙ্খল মিছিল সমাবেশে যোগ দেয়। তারপর একে একে নব মহাকরণ, মহাকরণ মধ্যাঞ্চল, সমাবেশে প্রবেশ করে। প্রশাসন যখন এই মিছিল দেখে দিশেহারা, যখন কর্মচারীর এই সম্মিলিত শক্তিকে দেখে ভীত তখন পুলিশ নব মহাকরণ থেকে বিশাল মিছিলটিকে আসার পথে বাধা দিতে থাকে। তবে তাতে কর্মচারীরা মাথা নত করেননি। সবশেষে সমাবেশে প্রবেশ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণাঞ্চলের মিছিল। রানী রাসমনি এভিনিউয়ের তিনটি লেন উপচে তখন কর্মচারীর ভিড় উপচে পড়েছে মঞ্চের পেছনে, পাশের ফুটপাথেও। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত মহানগরী। পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্য বুকে নিয়ে আগামী লড়াই সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়।

সমাবেশে প্রস্তাব উত্থাপন করার আগে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য বলেন, অনেক ক্লেশ সহ্য করে, রাজ্য সরকারের নানা ধরনের হুমকি উপেক্ষা করে, প্রশাসনের অসহযোগিতার মুখোমুখি হয়েও সুদূর কালচিনি থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সরকারী দপ্তর থেকে কর্মরত সরকারী কর্মচারীরা এই সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগ্রামী মনোভাবের প্রমাণ রেখেছেন। এক অস্থির অসহিষ্ণু পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশ চলেছে। কেন্দ্রে এক চরম দক্ষিণপন্থী সরকার ক্ষমতাসীন। একদিকে এরা হিন্দু রাষ্ট্রের আহ্বান নিয়ে অন্যদিকে নব্য উদারনীতির চরম প্রবক্তা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রমিক কর্মচারী, কৃষক, মেহনতী মানুষ, তপশীলি জাতি, অনগ্রসর মানুষের ওপর সম্মিলিত আঘাত হেনেছে এই সরকার।

▶▶ *(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)*

২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ কেন্দ্রীয় সমাবেশে উত্থাপিত প্রস্তাব

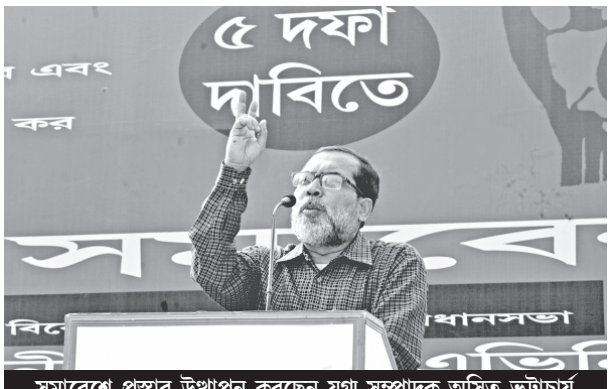

সমাবেশে প্রস্তাব উত্থাপন করছেন যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্তৃক আহূত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই সুবিশাল কেন্দ্রীয় সমাবেশ তীব্র অসন্তোষ ও গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিগত সাড়ে চার বছরের অধিককাল ধরে রাজ্যে এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। সমগ্র রাজ্য জুড়ে আইনের শাসনের অবসান ঘটিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জনগণের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপরও ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে শারীরিক আক্রমণ, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল, হুমকি, তোলাবাজি যেমন সংঘটিত হচ্ছে, তেমনি এই জুলুম, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার অধিকার, প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট করার অধিকার এমনকি নবান্ন সহ প্রধান প্রধান প্রশাসনিক দপ্তরে স্কোয়াড, সাধারণ সভা সহ পোস্টার মারার অধিকার কালা কানুন জারী করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর সাথে প্রশাসনের সর্বময় প্রধানের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার হুমকি, অর্থাৎ বঞ্চনা, অত্যাচারের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন এ রাজ্যে কোনো আন্দোলন চলবে না—এটাই পরিবর্তনের সরকারের শেষ কথা। অপরদিকে বহু সংগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অধিকারগুলি একে একে খর্ব করা হচ্ছে। মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরির সুযোগ আজ কার্যত রদ হতে চলেছে। কনফারমেশনের বিধি বাতিল করে নতুন নিয়োজিত গ্রুপ-সি কর্মচারীদের অর্ধেক বেতন এবং স্থায়ী হওয়ার বিষয়টিকেও শর্তকণ্টকিত করে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সরকারী আদেশ বাতিল করে বছর বছর নবীকরণের (পারফরমেন্স লিঙ্কড) ক্রীতদাস প্রথা চালু করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার হক্ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ সরকারের কাছে থাকা সত্ত্বেও সেগুলি কার্যকরী না করে ঠাণ্ডা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখা আছে। ওয়ার্কচার্জড কর্মচারীদের ১০ বছর চাকুরীকাল সমাপ্ত হলে স্থায়ী হওয়ার যে আদেশনামা ছিল তা স্থগিত রেখে নয়া আদেশ জারি করে স্থায়ী হওয়ার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনে বেকার যুবক-যুবতীদের কাজের সুযোগ কেড়ে নিয়ে ষাটোর্ধ্ব কর্মচারীদের নির্লজ্জভাবে পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। পি এস সি-র মাধ্যমে নিয়োগের সুযোগ খর্ব করা হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, সরকারী প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে নির্লজ্জ ভাবে ব্যবহার, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং নানা সময়ে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণাগুলি রূপায়ণে সীমাহীন ব্যর্থতা শাসক দলের জনবিরোধী ও কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ভূমিকাকে বে-আব্রু করে দিয়েছে। কৃত্যকবিধির নির্বিচার সংশোধন করে ডিটেলমেন্টের মাধ্যমে যে কোনো

▶▶ *(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)*

কেন্দ্রীয় সমাবেশের প্রধান বক্তা বিরোধী দলনেতা মাননীয় সূর্যকান্ত মিশ্রর বক্তব্য

আমাকে লাল সেলাম জানানোর কিছু নেই, আমরা যে আছি তাই আপনাদের লাল সেলাম জানাতে হয়। আপনারা অনেক দূর দূর থেকে এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন। এটা একটা কথার কথায় নয়, এটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে আমরা মনে করি, আপনারা যাঁরা লড়াই-সংগ্রামের ময়দানে আছেন, আছেন আরো অজস্র মানুষ—শ্রমিক, কৃষক, বেকার যুবক, ছাত্র, মহিলা, সামাজিক ভাবে নির্যাতিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ, আদিবাসী, তফসিলি, সংখ্যালঘু, নানান অংশের মানুষ, তাঁরা আছেন বলে আমরা আছি। তাঁরা যদি না থাকতেন, আপনারা যদি না থাকতেন, আমি বিরোধী দলের নেতা হতাম না, আমাকে আপনারা কেউ ডাকতেন না এখানে, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও করতাম না, আপনারাও শুনতে থাকতেন না। মানুষই ইতিহাস তৈরি করে, আর আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই মানুষের কাছে বারবার যেতে হবে। দাবি-দাওয়া আছে আপনাদের প্রস্তাবে, দাবির আমি ব্যাখ্যায় যেতে চাই না, কারণ এখানে সব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি জানি, আমি শুধু এইটুকু বলতে এসেছি, যে আমরা এই দাবিগুলির সঙ্গে আছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছি, এই নিয়ে যত লড়াই হবে, এই লড়াইতে আমরা সঙ্গে থাকব।

আমি আপনাদের যেটা বলতে এসেছি, সেটা হচ্ছে এই যে দাবি করে কিছু লাভ নেই এখন। কার কাছে দাবি করবেন? সরকারের কাছে? সরকারকে তো দেখলাম, এই তিন চার বছর দেখছি। এই সেদিন আবার দেখলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাধ হয়েছে ২৬ জানুয়ারি, উনি স্যালুট নেবেন। আমরা জানি ২৬ জানুয়ারি তো রাজ্যপাল স্যালুট নেন। রেড রোড পুরো বন্ধ করে (উনি প্রজাতন্ত্র দিবসের ওইটা করতে পারেননি), ওর পছন্দ মতো একটা প্যারেড করিয়েছেন। আর আমি দেখলাম উনি এইরকম করে স্যালুট নিচ্ছেন। এইরকম করে কেউ স্যালুট নেয় আমি জানতাম না। দেখেছেন কেউ কখনো! পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকলেন, দিল্লীতে মন্ত্রী থাকলেন, স্যালুটই নিতে শিখলেন না! দিন-রাত আপনাকে স্যালুট করতে আসছে আপনার লোকেরা। তো আমি বলছি এটাই যে, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, যে আমাদের রাজ্যে সরকার নেই, সার্কাস চলছে এখন।

কার কাছে দাবি করবেন আপনারা? কে আপনার দাবি পূরণ করবে? আমি প্রথম কথাটা যা আপনাদের বলতে চাই, যদি আপনাদের দাবি আদায় করতে হয়, দাবি পূরণ করতে হয়, রাস্তা একটাই আছে, এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা, এখান থেকে উৎখাত করা। বিকল্প সরকার চাই। আমি বলতে পারি আপনাদের, বামপন্থীদেরই প্রধান দায়িত্ব। মানুষের যে দাবি নিয়ে লড়াই হচ্ছে পাঁচ বছর ধরে, রাজ্যের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত, সেই দাবিগুলো আদায় করার জন্যই একটা বিকল্প সরকার, সেই দাবিগুলো যে পূরণ করতে পারে সেইরকম একটা সরকার গড়ে তোলবার জন্য বামপন্থীরা লড়াইয়ের ময়দানে আছে। বহু আক্রান্ত হয়েছে, বহু ঘরছাড়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মিথ্যা মামলা হয়েছে। তারপরেও তারা আত্মসমর্পণ করেনি, নতজানু হয়নি, সব সন্ত্রাস মোকাবিলা করে এগিয়ে চলেছে মুক্ত কণ্ঠের মিছিল, হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, জাঠা, পদযাত্রা, সভা, সমাবেশ, বিভিন্নভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য—যে তারাও ওই স্লোগানটা দিক—''লড়াই লড়াই চাই''। লড়াই মানে এখন খালি আলাদা আলাদা দাবির লড়াই না, এখন খালি অর্থনৈতিক দাবির লড়াই না, এ হল একটা রাজনৈতিক সংগ্রাম।

এই সংগ্রাম হচ্ছে, একটা ক্ষমতার জন্য। খুবই ছোট ক্ষমতা। রাইটার্স বিল্ডিংসের যে ক্ষমতা তাকে ক্ষমতা বলাই যায় না। যাই হোক, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন রাইটার্স বিল্ডিংসে না বসে নবান্নে বসছেন। আর উনি যে ক্ষমতা দেখান, তা সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা। সংবিধানে নেই। একটা স্বৈরাচারী সরকার কায়েম রয়েছে। আমরা সত্তরের দশকের মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি। আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস দেখেছি। জরুরি অবস্থা দেখেছি, কিন্তু এরকম স্বৈরাচারী মুখ্যমন্ত্রী আমি রাজ্যে দেখিনি। আপনাদের যাঁদের বয়স বেশি তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। আমি জানি না সব মিলবে কিনা। আপনাদের অধিকার আছে মিলিয়ে দেখার। প্রত্যেকবার এই পাঁচ বছরে আপনারা যখন কোনো ধর্মঘট ডাকেন বা কেন্দ্রীয় ভাবে ধর্মঘটের কোনো ডাক থাকে আপনাদের, উনি প্রথমেই বলেন যে ধর্মঘট নিষিদ্ধ। মাইনে কেটে নেবেন। আমি ওনাকে বলেছিলাম আপনি ওসব পারেন না, সংবিধান বহির্ভূত, আইন বহির্ভূত কাজ আপনি করছেন। যেখানে যেখানে আদালতে গেছে মানুষ উনি হেরেছেন, আর যেগুলো হারতে বাকি আছে, সেগুলোতেও হারবেন। অবশ্য আপনাকে বেশি দিন লড়াই করতে হবে না। কারণ আপনি বেশি দিন আর থাকবেন না। কয়েকদিন... আর কয়েকদিন আপনি আছেন।

আমরা যখন বিধানসভায় জিজ্ঞাসা করি, উনি বলেন শ্রম দিবস পশ্চিমবঙ্গে একদিনও নষ্ট হয়নি। সরকারকে আমরা জিজ্ঞাসা করি—আপনি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শ্রমদিবস নষ্ট করছেন কত তার ঠিক আছে! যখন যা ইচ্ছে হল যা একটা ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। কিসের জন্য, কি কারণে বোঝা খুব মুশকিল। আর যেটা আমরা বলেছিলাম সেটাই করলেন না। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে বেশি দূর নয় তাঁর

সভাপতিমণ্ডলী ও আমন্ত্রিত সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ

মূর্তি। ২৩ জানুয়ারি, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে আমরা বামপন্থীরা যখন সরকারে ছিলাম, তখন আমরা বলেছিলাম, যে এটা দেশপ্রেম দিবস হিসেবে পালিত হোক। সরকার সেরকম সার্কুলারও দিয়েছিল। সে বছর তাই হয়েছিল। তিনি এসেই চার বছর বন্ধ করে দিয়েছেন। চার বছর পার করে ফেলেছেন। উনি এখান থেকে, অর্থাৎ কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যান ওখানে, অর্থাৎ পাহাড়ে। আসলে গরম এখানে বাড়লে উনি পাহাড়ে চলে যান আর ওখানে ঠাণ্ডা পড়লে বেশি, এখানে নেমে আসেন। দেশপ্রেম নয়, উনি এখন চৌষট্টিটা ফাইল টাইল বের করেছেন, তা নিয়ে আমি বিশদে যাচ্ছি না। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

এখন তো কমপিটিশন করছেন। এখানে দিদি আর ওখানে কেন্দ্রে দাদা। লোকে ঠাট্টা করে বলে ''এখানে দিদিভাই ওখানে দাদাভাই মাঝখানে সি বি আই''। কিন্তু কমপিটিশন হচ্ছে, ওখানে ১০০টা ফাইল বের করেছে, আরো নাকি মাসে মাসে বেরোবে। আচ্ছা নেতাজি কি আপনাকে এইসব শিখিয়েছেন নাকি? যা যা আপনি করছেন, যা যা আপনি বলছেন। এই ভাষা, এই কাজ, এই শিখেছেন আপনি? আপনি যখন এত রকম উৎসব করতে পারেন, তখন শ্রম দিবস নষ্ট হয়না? আপনি যখন যান জেলায় জেলায়, একটা জেলায় একটা মুখ্যমন্ত্রীর সফর পিছু এক কোটি টাকা? আজকাল তো আপনি আকাশপথ ছাড়া যান না। তার খরচ আছে। হেলিপ্যাডের খরচ আছে। হেলিপ্যাডের পাহারার খরচ আছে। আর নিরাপত্তা, আপনি যেখানে যেখানে সব শান্তি বলেছেন, সব হাসছিল, জঙ্গলমহল হাসছিল, পাহাড় হাসছিল, আমরা বলেছিলাম হাসছে না, কাঁদছে, আপনি বুঝতে পারছেন না। শুনতে পারছেন না। এখন তো বুঝতে পারছি—কি হচ্ছে তা আপনারা বুঝতে পারছেন না। আগের মুখ্যমন্ত্রীদের যা নিরাপত্তা লাগত তার দেড়গুণ বেশি লাগছে। আর যা খাওয়া দাওয়া! প্যাটিস খাইয়েছেন দার্জিলিং-এ ২৫ হাজার টাকার! তাহলে আপনি ভাবুন বাকি খেলে কি হবে! কিসের প্যাটিস তাও জানিনা। বাকি সব যা খানা-পিনা হয় সবই তো আপনারা বোঝেন।

যদি বলি আপনি এই সব করছেন—উনি বলেন বেশ করছি। এটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের কণ্ঠস্বর। বেশ, আপনি করেছেন আপনি করুন, আমি বলেছিলাম আপনি উৎসব করতেই পারেন। কে বলেছে আপনি উৎসব করবেন না। উৎসব আমরাও করবো। একদিনই করবো, বেশিদিন করবো না। আপনি চলে যাওয়ার পর সেই উৎসবটা হবে। কিন্তু উৎসব করলে আমরা আমাদের পয়সায় করবো। সরকারের পয়সায়, জনগণের পয়সায় আপনি উৎসব করছেন, করে বলছেন—বেশ করেছি? আর আমি দেখছি কাগজে ছাপা হয়েছে, মাটি উৎসব হচ্ছে। মাটি উৎসব করছেন, মাটি চোরদের একটা পার্টি আছে, তাদের সঙ্গে কয়লা চোর, লোহা চোর থেকে আরম্ভ করে যতরকম যা কিছু চুরি সম্ভব তাদের দ্বারা সব হচ্ছে। মাটি উৎসব হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে যাওয়ার কথা, থাকবার কথা তার জন্য বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কাগজে ছবি বেরোচ্ছে। শুনলাম ওটা নাকি মাটির বাড়ি। আসলে সিমেন্টের বাড়ি, কিন্তু মাটির মতো রং করা। কাগজে কলমে এ হল মাটির বাড়ি, কুঁড়ে ঘর। ২৫ লাখ টাকা খরচ মাত্র! আর আসল খরচ একজন করছেন। কাগজে দেখছি, আমি জানি না। এক কোটি টাকা খরচ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী এক মিনিটের জন্য সেখানে যাবেন বলে। আর কবে যাবেন, না, যাওয়ার কানো চান্স নেই। আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে তো যাবেন! কেন যে এগুলো তৈরি করছেন, কত দেদার খরচা হচ্ছে, এখানে ওখানে।

আর যখন আমরা বিধানসভায়, আপনাদের ডি এ-র কথা জিজ্ঞাসা করি, বলেন বাকি নেই। আপনারা শুনেছেন, জানেন আপনারা। তিনি কখনও সত্যি কথা বলেন না, সবসময় মিথ্যা কথা বলেন। মিথ্যাচার ছাড়া এরা চলতে পারে না। স্বৈরাচার আর মিথ্যাচার সবসময় পরস্পরের সঙ্গী, সম্পর্কযুক্ত। উনি যদি বলেন যে এটা হয়েছে, আপনি বুঝবেন এটা কিছু হয়নি। উনি আজকাল আকছার বলছেন, এত হয়েছে, অমুক পেয়েছে, তমুক পেয়েছে। এত শিল্প হয়েছে। এত বেকার কাজ পেয়েছে। আমি একটা সহজ হিসাব বলেছিলাম, যে আপনি যা হিসাব দিয়েছেন তাকে আপনি ভাগ করে নিন। বুঝতে পারবেন, রাজ্যে এত বেকার কাজ পেয়েছে যে প্রতি বুথে ৮৮ জন করে হয়। বুথ সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই বেরিয়ে যায়। আপনারা কোনো না কোনো বুথ থেকে এসেছেন। ওদের সাথে দেখা হলে আপনারা বলবেন, যে ৮৮ জনের তালিকা যেন ওরা নিজেরা খুঁজে বার করে। এটা তো আমাদের কারোর পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু ৮৮ জন বেকার কারা কাজ পেল মুখ্যমন্ত্রীর আমলে? সত্যি কথা বলছেন না। এটা ভাবুন বিধানসভার প্রশ্নোত্তরে যারা সত্যি বলেন না, সেখানে বাইরে সত্যি বলবেন? যা বলছেন করেছি, আসলে সেটা করেননি। কিছু করেছেন, কিছু করেননি তা আমি বলবো না। কিছু রাস্তাঘাট করেছেন। বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জের ভেতরে পাকা বাড়ি করেছেন, তবে বেশিরভাগ রাস্তাই আমরা করেছি ৩৪ বছরে। কিছু পাকা বাড়ি হয়েছে যার নাম হয়েছে কিষাণ মান্ডি। কৃষক বাজার। কিছু বড় বাড়ি হয়েছে যেখানে মাল্টি স্পেশালিটি, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল হবে। আসলে আপনি যদি কোনো নতুন বাড়ি দেখেন, নতুন লাইট পোস্ট দেখেন, নতুন নীল রং দেখেন, যদি নতুন রাস্তা হয়ে থাকে দেখেন, তাহলেই বুঝবেন, নিশ্চয় এর পেছনে কমিশন আছে, কন্ট্রাকটার আছে। তাই এই কাজগুলোয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আর কিছু হয়নি। আমি প্রায়ই বলি আপনাদের, কন্ট্রাকটরদের সাথে যদি জানা শোনা থাকে তাহলে বলবেন বিল যা পাওনা আছে সরকারের কাছে মিটিয়ে নিতে, কারণ এর পরে এই বিল পাওয়া খুব মুশকিল হবে।

শিলিগুড়ির মেয়র এসে বলছেন যে ফাইল খুঁজছি, খুঁজে দেখছি যে বকেয়া বিল চাইতে এসেছে কিন্তু আমি দিতে পারছি না। এর কারণ হচ্ছে যে কাগজ নেই, টেন্ডার নেই, কিছুই নেই। আর তার চাইতে আরো মুশকিল হচ্ছে যে কাজ হওয়া জিনিসটাই নেই। ওটা আপনারা জানেন তো যে মরে গিয়েও নিস্তার নেই। যে চুল্লিতে পোড়াবে সেই চুল্লি নিয়েও ২০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, আপনারা জানেন। যদিও এটা অন্য ফান্ডের টাকা, যাই হোক, সেই ২০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে এই চুল্লিটাই বাস্তবে নেই। অথচ চুল্লির টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আর যেটা দেওয়া হয়নি সেটা মেলে কি করে। সেজন্য বলছি যারা সত্যি সত্যি কিছু কাজ করেছেন, বিল পাওয়ার আছে, এখন নিয়ে নিন। তারপরে এটা তো পাবেন না আপনি। কাকে বলতে যাবেন?

যা যা বলছেন এটা করেছি, ওটা হয়েছে, তার মানে হয়নি। আর যা যা বলছেন হয়নি সেগুলো বুঝবেন হয়েছে। বলছেন পার্ক স্ট্রীট হয়নি, কাটোয়া হয়নি, এরকম আরো অনেক আছে আমি বলতে পারছি না। কামদুনি বেরিয়েছে আমি শুনলাম। ৩০২ ধারায় ছয় জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ৩০২ তো খুনের ধারা, গণধর্ষণের মামলার কি হল আমি বুঝতে পারছি না। সাজা কাল ঘোষণা হবে। যেদিন ঘটনা ঘটেছিল আমি ওখানে গিয়েছিলাম। ওর বাড়িতে ওর মা-বাবার সাথে কথা বলতে ওই কামদুনি গ্রামে। মুখ্যমন্ত্রী অনেক পরে পৌঁছেছিলেন। তা সবাই জানেন। গিয়ে বলেছিলেন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট হবে। এক মাসের মধ্যে হবে। হয়নি। এক মাস গেল, এক বছর গেল, দু'বছর গেল, প্রায় তিন বছর হতে যাচ্ছে, কিরকম ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট হচ্ছে দেখছেন। হবে বললেই আপনি ভাববেন হয় কোনটা? যেটা বলেছেন হবে, কোনোদিন হয়েছে নাকি? আর যেটা হয়নি বলবেন সেটা বুঝবেন হয়েছে। স্বৈরাচার চিরকাল অসত্য ভাষণের ওপর নির্ভর করে চলে। আর সেটা উনি রেকর্ড করেছেন। এমন একটা দিন যায়না যেদিন মুখ্যমন্ত্রী একটা অসত্য কথা বলেন না। কিন্তু বড় বিপদ হচ্ছে এটাই যে উনি ৩৪ বছর, ৩৪ বছর করেন। আমি ওকে বলবার চেষ্টা করছি যে আপনি ৩৪ বছর ভুলতে পারবেন না আর মানুষকেও ভোলাতে পারবেন না। আপনার পেছনে তাড়া করে বেড়াচ্ছে ৩৪ বছর। আপনি যা সব রেকর্ড তৈরি করেছেন যে সব জিনিস হয়েছে বলছেন, তা হয়েছে ৩৪ বছরে। ওই যে আমি বললাম কেউ কি ৩৪ বছরে দেখেছে ওইরকম করে স্যালুট নিতে? ৩৪ বছরে আপনারা কখনো দেখেছেন, যেমন এখন আমরা বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছি। আপনারা যেখানে কাজ করেন অফিসে, আমি যেখানে মন্ত্রী হয়ে বসতাম, বহুদিন দেখেছি, টিফিনের সময় ব্রেক হলে একদল কর্মচারী মিছিল করতেন, যাঁরা সরকার বিরোধী। এবং এই স্লোগানও আমি শুনেছি, ''জ্যোতি বসুর কালো হাত ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও''। জ্যোতি বসু—মুখ্যমন্ত্রীর নাম ধরে স্লোগান দেওয়া হত। আজকের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই এ কথাগুলো—একটা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সূর্যকান্ত মিশ্রর বক্তব্য

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

লোকেরও চাকরি তখন যায়নি, সাসপেন্ড হয়নি, ট্রান্সফার হয়নি। প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং আপনাদের সংগঠনের পুরোনো নেতৃত্ব অনেকে এখানে আছেন তাঁরা বলতেন—আচ্ছা আপনারা এই লোকটাকে কিছু করছেন না কেন? সঙ্গত কারণে বলতেন। আপনাদের সঙ্গে এত খাতির কিসের। এত বন্ধুত্ব কিসের। আমাদের অপরাধ এটাই যে আমরা বিরোধীদের বেশি গণতন্ত্র দিয়েছিলাম। মানুষের যা পাওয়ার কথা তার চাইতে বেশি গণতন্ত্র। সেটাই তো প্রকৃত গণতন্ত্র।

দিল্লীর সরকার আর এই মুখ্যমন্ত্রী—এঁরা এখন সহনশীলতার কথা বলছেন। আমি বলেছিলাম যে সবচাইতে অসহিষ্ণু কেউ যদি থাকেন এখানে তাহলে সেটা আপনি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন একনম্বর। সবচাইতে অসহিষ্ণু। এখন খালি আমরাই আক্রান্ত হইনি। সল্ট লেকে ইলেকশন হচ্ছে, সংবাদ মাধ্যম গেছে, এতগুলো সংবাদ মাধ্যম এক সাথে আক্রান্ত হয়েছে। কেউ বলতে পারবে ৩৪ বছরে এই রকম দেখেছে কেউ? কেউ দেখেছে পুলিশ সেই সময় আক্রান্ত হয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে আছে? আর যারা থানা আক্রমণ করলো তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরছে? কেউ কখনও ৩৪ বছরে দেখেছেন পুলিশকে কোনো মন্ত্রীর জুতোর ফিতে বাঁধতে হয়েছে? কে কবে দেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী অফিসারকে বলছেন ''চাবুকে পিঠের ছাল তুলে নেব''!

বামফ্রন্ট সরকারই একমাত্র সরকার সারা দেশে যখন মানবাধিকার নিয়ে চর্চা হচ্ছে, প্রথম মানবাধিকার কমিশন এ রাজ্যেই গঠিত হয়েছিল। আজ যারা বিচার করবেন মানবাধিকার কমিশনের হয়ে, যে সব অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে, সেই পুলিশের প্রধান যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁকেই করে দিয়েছেন মানবাধিকার কমিশনের মাথা!

বামফ্রন্ট সরকার হচ্ছে সেই সরকার, দিল্লীতে যখন লোকপাল নিয়ে অনেক আন্দোলন হচ্ছে, তার বেশ কয়েক বছর আগেই আমরা বামপন্থীরা এখানে লোকায়ুক্ত গঠন করেছিলাম। আর লোকপাল নিয়ে তখন বড় বিতর্ক হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ থাকে লোকপাল সেটা বিচার করতে পারবে কিনা। আমরা এখানে আইন করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও যদি কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে লোকায়ুক্ত তা বিচার করতে পারবে।

কে কবে দেখেছিল যে এই রাজ্যে কিংবা সারা ভারতে, আমি একটু আগে যে নির্বাচনের কথা বললাম তা নিয়ে যখন এত অভিযোগ, ভুরি ভুরি প্রমাণ, জালিয়াতি আর যেরকম করে দখল হচ্ছে তার, তখন নির্বাচন কমিশনার একটা কথা বলেছিলেন, যে কিছু হয়তো রিকাউন্টিং হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। এটুকু বলাতেই একজন এম পি আর একজন মেয়র মিলে চারজন গিয়ে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে চার ঘণ্টা কি করলো তাঁকে আপনারা বুঝতে পারেন? কী হল যে এর পরেই নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগ করতে হল? নির্বাচন কমিশনার, যিনি হাইকোর্টের বিচারপতির সমমর্যাদা বহন করেন, যাঁকে সরকার, রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি কেউ সরাতে পারেন না, কেবল মাত্র লোকসভায় ইম্পিচমেন্টের মাধ্যমে তাকে সরানো যায়, তাকে বাধ্য করা হল পদত্যাগ করতে!

বার বার আমি এই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, কেউ কেউ এটাও ৩৪ বছরে দেখেছিল, আপনি কেন্দ্রে কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন। পরে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল গড়ে বিজেপির সাথে মন্ত্রী হয়েছিলেন, পরে আপনি আবার কংগ্রেসের সঙ্গে, আবার বিজেপির সঙ্গে, এ নিয়ে পাঁচবার হয়ে গেল। তখন আপনি প্রত্যেক দিন একটা করে সি বি আই চাইতেন। ৩৪ বছরে আপনি কখনও বলতে পারবেন যে দিল্লীতে আপনি যতদিন ছিলেন একজন বামপন্থী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটাও সি বি আই করাতে পেরেছিলেন? সরকারে থেকেও আপনি একটাও করাতে পারেননি। আপনাদের পাঁচ বছরও শেষ হতে যাচ্ছে। আর পাঁচ বছর ধরে আপনি বলে যাচ্ছেন আমাদের বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে, আমি নিজেও বলেছিলাম যে আপনি আসুন, আমি বসে আছি পথ চেয়ে, ফাগুনের গান গেয়ে, কবে আসবে ধরতে আমাকে। তবে আজ আমি জেল যাই কোয়ালিফিকেশন বাড়াই। আপনার কোয়ালিফিকেশনে বড় হচ্ছে, বিদেশের কোন ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেয়েছেন। আমাদের বামপন্থীদের কাছে বড় কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে, কত লড়াইয়ে মধ্যে ছিলাম, কত রক্ত ঝরিয়েছি, কত ঘাম ঝরেছে, কত জায়গায় আমরা সন্ত্রাস অতিক্রম করে এগোতে পেরেছি, কত বার গ্রেপ্তার হয়েছি, কতদিন জেল খেটেছি। পাঁচ বছর গেল কিন্তু আপনি জেলে আমাদের একজনকেও ঢোকাতে পারলেন না। উল্টে আপনাদের কয়েকজন জেলে ঢুকে বসে আছেন। একটা মন্ত্রীসহ কয়েকজন এম পি। আপনি টানা হ্যাঁচড়া করছেন কিন্তু বের করতে পারছেন না। একটাকে টানা হ্যাঁচড়া করছেন, বাকিগুলোকে ওখানে রাখতে চান। ওকে টানা হ্যাঁচড়া করছেন কারণ ও নাকি বলেছে, আমি জানিনা এটা সত্যি কিনা, যে ''সব বলে দেব, সব বলে দেব''। ওই একটা কথা, বেশি কিছু না। কিন্তু বের করতে পারছেন না।

ওপর থেকে নীচ কে বাদ থাকছে? ২১৩ কোটি টাকা শুধু মাটিতে চুরি। টাকা মাটি মাটি টাকা। একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে সাত কোটি, আট কোটি টাকা। আপনারা যাঁরা ব্লকে ইত্যাদিতে কাজ করেন, আপনারা অনেকে হয়তো খবর পান, যে এই টাকার কোনো কাজ নেই। মাস্টার রোল হয়তো আছে, কিন্তু কিছুই বাস্তবে নাই, মাটি সাফাই।

সাইকেল দিয়েছেন আমি জানি না, আমি যেখানেই যাই, সুদূর জলপাইগুড়িতে গিয়ে শুনছি, ইনি সাইকেল দিয়েছেন। সব কমিশন। আমি বললাম না ''যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।'' আমি আবার মুখ্যমন্ত্রীর মতো কবিতা মুখস্থ রাখতে পারি না। উনি স্বভাব কবি তো। নিজেই লিখে ফেলেন। ছড়া, অনেক বই লিখেছেন। এবং তা বেঁচে ওঁর পার্টি চালান। কত বড় ব্যাপার! আমাদের কিছু ছাপতে হলে আমাদের অনেক খরচা হয়ে যায়। ছাপার খরচা ওঠে না অর্ধেক সময়। আমি বললাম না, একটা যদি নতুন রাস্তা দেখেন, একটা নতুন ল্যাম্প পোস্ট, একটা ত্রিফলা আলো দেখেন, কোথাও দেখলেন নীল সাদা হয়ে গেছে রং, যদি দেখেন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, নতুন একটা গেট হয়েছে দেখেন, যেখানে যা হয়েছে দেখবেন, এই যে সাইকেল নতুন দিচ্ছে মানে ওখানেও কমিশন। জলপাইগুড়িতে আমি গিয়ে শুনলাম মানুষ বলছে, যে ওরা সাইকেল ওজন করেছে, বাড়িতে যে সাইকেল ছিল তার সঙ্গে। ওটা এক পাল্লায় আর আরেক পাল্লায় সরকার যেটা দিয়েছে সেটা। ওজোনে পুরোনোটা পাঁচ কেজি বেশি, নতুনটা পাঁচ কেজি কম। সাইকেলের ওজন ভাবতেও পারি না! তারপর ওরা আমাকে বোঝালেন যে, সাইকেলে ছটা বল বেয়ারিং থাকে, নতুনটায় তিনটে বল বেয়ারিং। টায়ার টিউব নিয়ে আরো মুশকিল। বলছেন ঘোড়া ছিল না, ঘোড়ার ঘাসও ছিল না। কোনো ঝামেলা ছিল না। আর সাইকেল দিয়েছে, এই সাইকেল দাঁড় করাতে প্রত্যেক দিন রিপেয়ার করতে করতে বিরাট খরচা। এই ঝামেলা ছিল না। বলছে, অনেকে সাইকেল বিক্রি করতে চাইছে। তারও এখন বাজার পড়ে গেছে। কারণ ওই সাইকেল দরকার নেই। তার বাড়িতে সাইকেল আছে। তার চাইতে বড় কথা হচ্ছে যে সাইকেল কি আমাদের মা বোনদের নিরাপত্তা দিয়েছে? ওনার কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, আর পাঁচটা শ্রীর মতো বিচ্ছিরি এসব কি নিরাপত্তা দিতে পেরেছে আমাদের মা বোনেদের? ওই সাইকেল নিয়েই তো ফেরার পথে কিংবা হয়তো সাইকেল ছিল না বলে যাওয়ার পথে একটা বৃষ্টি ভেজা পথে ঘটনাটা ঘটল। আমাদের ওই ষাট বছর থেকে সত্তর বছর মা বোনেরা তাঁদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন যে ঘটনা ঘটছে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি।

তো সবই টাকা, টাকা ছাড়া কিছু হচ্ছে না। সব তোলা, তোলাবাজ। বেকারদের কাজ হবে আমি বললাম, কি অবস্থা। বেকারদের কাজ পাওয়া তো দূরের কথা, শ্রমিক যারা কাজ করছে তাদের বেকার করাচ্ছে সরকার। এখানে একটাই শিল্প হয়েছে, যেখানে বেকার উৎপাদন হয় প্রত্যেক দিন। কারণ কারখানা বন্ধ হচ্ছে। চা বাগান বন্ধ হচ্ছে, চটকল বন্ধ হচ্ছে, আর লাখ লাখ বেকারের সাথে যুক্ত হচ্ছে, পঞ্চাশ ষাট হাজার বেকার শ্রমিক। বেকার কোথা থেকে কাজ পাবে। যেখানে নতুন কারখানা হওয়ার কথা, সেখানে পুরোনো কারখানা সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলেছি উনি কাকতাড়ুয়ার মতো শিল্প তাড়াচ্ছেন। তাঁকে না তাড়ালে এখানে শিল্প হবে না। কলকারখানা হবে না। বেকারদের কাজ হবে না।

লক্ষাধিক পদ খালি পড়ে আছে, প্রাইমারি স্কুলে, মাধ্যমিক স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। সব জায়গায় ঠিকা পদ্ধতিতে নিয়োগ হচ্ছে। অর্ধেক বেতন দিয়ে লোক নিয়োগ হচ্ছে। ষাট পেরোলেও তাকে চাকরিতে রেখে দেওয়া হচ্ছে। এখন তো ডায়েড-ইন-হারনেস এর চাকরিও হচ্ছে না। টেট পরীক্ষা দুবার হল। পাঁচ বছরে দুটো পরীক্ষাই করতে পারে না। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি ক্ষমতা থাকলে ফলটা বের করুন। উনি তা পারছেন না। কারণ টাকা যারা দিয়েছে, তারা বসে আছে তাদের নাম থাকবে কি থাকবে না। আর তারপর বুঝতে পারছেন তাদের অনেকের ঘর ছাড়তে হবে। অসুবিধা হচ্ছে এখানে।

রাস্তা একটাই, শুধু না, হয়নি, এসব বলা না, এটা করতে হবে। যে দাবির লড়াইয়ের জন্য আপনি আছেন, যে যেখানে আছেন, এই দাবিগুলোই হবে লড়াইয়ের ইস্তেহার, সংগ্রামের ইস্তেহার, এ দাবি অর্জন করতে হবে। আর তার জন্য চাই একটা বিকল্প সরকার। বামপন্থীদেরই প্রধান দায়িত্ব। বামফ্রন্টই তৈরি করবে সে ইস্তেহার। আমি এটাই বলতে পারি যে, যেসব দাবি নিয়ে আপনারা লড়াই করছেন, সে দাবিগুলোই হবে ইস্তেহারের ভিত্তি।

এরা রেশন কার্ড দিচ্ছে আর জেলায় জেলায় যখন যাচ্ছি আমি খবর পেলাম একটা বিধানসভায় এলাকায় ২০ শতাংশের কম রেশন কার্ড পাবেন। মানে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ প্রাপ্য খাদ্য সুরক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ এলাকায় এলাকায় এ কথা বলছেন। আমরা চাই যে প্রত্যেকটা মানুষ যারা ইনকাম ট্যাক্স দেয় তাদের বাদ দিয়ে বাকিরা সবাই ২ টাকা কিলো চাল, গম যে খাদ্য সুরক্ষা যা বামপন্থীরাই চালু করেছিল তাকে সমস্ত মানুষের কাছে, সর্বজনীন ভাবে করতে চাই। সব মানুষের মাথার ওপর ছাদ চাই, পানীয় জল চাই, প্রত্যেক বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌছানো চাই, শিক্ষার অধিকার চাই। স্বাস্থ্যর অধিকার চাই। আমরা ৩৪ বছরের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, কোনটা করা উচিত ছিল, কোনটা উচিত ছিল না সেটাও আলোচনা করেছি। আমরা আমাদের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আমরা তা বুক চাপড়ে স্বীকার করি। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়, একমাত্র আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কোনো ভুল হয় না।

আমাদের ভিত্তি আরো শক্ত করতে হবে। কৃষকের মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে হবে। কী করে বন্ধ কল কারখানা খোলা যায় সেটা দেখতে হবে। আর যেগুলো উনি তাড়িয়েছেন, সেগুলো কী করে ফিরিয়ে আনা যাবে তা দেখতে হবে, কী করে আরো কর্মসংস্থান করা যায় সেটা ভাবতে হবে। যাঁদের কোনো কাজের নিরাপত্তা নেই, সেই অস্থায়ী কর্মচারী, শিক্ষক, আই সি ডি এস, আশা, মিড ডে মিল এইরকম নানারকম কাজে যাঁরা আছেন, তাঁদের কী করে একটা নিরাপত্তা দেওয়া যায় সেটা দেখতে হবে। বয়স গেলে খেটে খাওয়া মানুষের সামাজিক সুরক্ষার জন্য আমরা কী করে দিতে পারব, গণবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে কিছু জিনিস কী করে আমি মানুষের হাতে তুলে দিতে পারব, আর সবচাইতে বড় হচ্ছে, মানুষের অধিকার যা লুণ্ঠিত হয়েছে, তা কী করে ফিরিয়ে দিতে পারবো। আমরা মানুষকে এই বার্তা দিতে চাই যে আপনি যে রাজনৈতিক দলই করুন, আপনার যে অধিকার ছিল, ওই মহাকরণের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ''জ্যোতি বসুর কালো হাত ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও''। আপনি আবার বলতে পারবেন, আপনার বলার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আপনি আমার বিরুদ্ধে বলতে পারবেন, তার জন্য আপনাকে ঘরছাড়া হতে হবে না। একটিও মিথ্যা মামলা হবে না। যাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে, সেই মামলা গুলো একেকটা করে প্রত্যাহার করা হবে। যাঁদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের শাস্তি রদ করা হবে। যাঁদের মাইনে কাটা হয়েছে, সেগুলো রদ করা হবে। মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। লোকায়ুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। মহিলা কমিশন, তফসিলী জাতির কমিশন, আদিবাসী, সংখ্যালঘু কমিশন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা এখানে পত পত করে উড়বে। আর যারা খুন, ধর্ষণ এ জাতীয় সব অপরাধ করেছেন তাদের ঠাঁই হবে জেলে।

সামনে যে লড়াই শুরু হবে সে লড়াইতে আমরা বামপন্থীরা যে ডাক দিয়েছি, ''তৃণমূল হঠাও বাংলা বাঁচাও'' আর তারপরের লড়াই ''বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও''। আর সে লড়াইয়ের জন্যে বাম দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবাংলাকে গণ সংগ্রামের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এই লড়াই অনেক সুদূরপ্রসারি লড়াই। এ লড়াই বাংলার ভবিষ্যতের জন্য লড়াই, দেশের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই। আমরা চাই এ লড়াইতে আপনারাও থাকবেন। মানুষের কাছে যেতে হবে। আপনারাও যাবেন, প্রত্যেক কর্মচারীর কাছে, সেই সব কর্মচারী, দেখবেন না কে কোন সংগঠন করে, দেখার কোনো দরকার নেই। তিনি কর্মচারী সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। তিনি শ্রমিক সেটাই বড় কথা। যে যেখানে বঞ্চিত, নিপীড়িত, আক্রান্ত সবার কাছে আমাদের পৌঁছোতে হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি এই সবাইকে নিয়ে এই লড়াইয়ে, এই সংগ্রামের যে জোট গড়ে তুলবেন তার মধ্য দিয়ে আমাদের যে লক্ষ্য আমরা তা অর্জন করবো। আমরা পারব বাংলাকে বাঁচাতে। আমরা পারব দেশকে বাঁচানোর যে লড়াই সে লড়াইয়ের ঘাঁটি তৈরি করতে এই বাংলায়। সেই লড়াইতে আপনাদের দাবিও পূরণ হবে। সেই দিন আমি এই মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারি যদি সুযোগ হয়, সেদিনটায় আপনাদের এখানে জায়গা হবে কিনা জানিনা। কিন্তু কোথাও একদিন আমরা মিলিত হব। কয়েক ঘণ্টার একটা উৎসব সমাবেশে। সেদিনের জন্যই আমরা লড়ছি, লড়ব। শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে, শেষনিশ্বাস দিয়ে। □

(অনুলিখন মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

রোহিত ভেমুলা

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

বন্ধুদের লেখা চিঠির এক জায়গায় ভেমুলা লিখেছেঃ আমি লেখক হতে চেয়েছিলাম, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক, কার্ল সাগানের মতো।... আমি ভালোবাসতাম বিজ্ঞান, নক্ষত্র, প্রকৃতি। কিন্তু তারপরে আমি ভালোবেসেছিলাম মানুষকে। ..... আমাদের অনুভূতিগুলি সব নকল। আমাদের ভালোবাসা মেকি। আমাদের বিশ্বাসগুলো রঙ মেশানো। একজন মানুষের মূল্য এখন গিয়ে ঠেকেছে তাঁর পারিবারিক পরিচয়ে, ভোটে, একটা নম্বরে, একটা বস্তুতে, কাউকে তাঁর মন দিয়ে বিচার করা হয়না।''

রোহিত ভেমুলার বিজ্ঞান লেখক কার্ল সাগান হওয়া আর হবে না, কিন্তু মানবতা, সহিষ্ণুতা, বহুত্ববাদের পক্ষে লড়াইয়ের যোদ্ধা হিসাবে প্রাণ দিয়ে অমর হয়ে গেলেন তিনি। ফ্যাসিবাদী শক্তির গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে বিপন্ন করা এবং মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জাত-পাতের সমস্যাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টার বিরুদ্ধে সমাজের সব অংশের মানুষের যে সংগ্রাম চলছে, রোহিতের এই প্রাণদান নিঃসন্দেহে তাকে প্রেরণা যোগাবে, আরও বলিয়ান করবে। □

—মানস কুমার বড়ুয়া

জেলা সমাবেশ

বর্ধমান ঃ জরুরী ৫ দফা দাবিতে জেলা সমাবেশ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ বেলা ২ টায় বর্ধমান টাউন হল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মচারীরা মিছিল করে কোর্ট কম্পাউন্ড (কাছারি রোড) থেকে সমাবেশে যোগ দেন। মিছিলে এবং সমাবেশে প্রায় দেড় হাজার কর্মচারী যোগ দিয়েছিলেন।

মূল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি প্রণব আইচ, সহ-সভাপতিদ্বয় রফিউদ্দিন আহমেদ ও নারায়ণ মিত্র। সমাবেশে প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলার যুগ্ম সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী, প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দে, আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম নেতা অশোক চ্যাটার্জী। সবশেষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। □

উত্তর দিনাজপুর ঃ গত ৭ জানুয়ারি '১৬ জেলায় দুটি জায়গায় জেলা জমায়েতের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। প্রথম কর্মসূচীটি জেলা সদরে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৩৫০ জন কর্মচারী বন্ধু। সেখানে সভাপতিত্ব করেন মাধবী দেবনাথ ও দীপক পাল। প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহিউদ্দীন আহমেদ, সহ-সম্পাদক এবং প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন দীপক চ্যাটার্জী, যুগ্ম সম্মাদক। অন্যদিকে ইসলামপুরের কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন পরিতোষ সাহা এবং সরলা সোরেন। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অশোক কুণ্ডু, মহকুমা যুগ্ম-সম্পাদক এবং প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মহকুমা সম্পাদক রথীন দাস। □

সমাবেশে উত্থাপিত প্রস্তাব

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

কর্মীকে যে কোনো বিভাগে বদলী করার আদেশনামা প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মচারী আন্দোলনের বহু অর্জিত অধিকার বর্তমান সরকার হরণ করে কর্মচারী স্বার্থবিরোধী আদেশনামা প্রকাশ করে চলেছে। জনগণের কাজের স্বার্থে সুষ্ঠু ন্যায়সঙ্গত বদলী নীতিগুলিকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সদস্য, নেতা ও কর্মী সকলকেই দূর-দূরান্তে বদলী করা হচ্ছে। তিন মাস অন্তর বৈঠকের প্রতিশ্রুতি, কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসম্মত দাবি দাওয়ার মীমাংসার প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি আজ বিলীন। শুধু তাই নয়, কর্মচারীদের জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে চার ডজন চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তার প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয়নি। মন্ত্রী, মুখ্যসচিব, প্রধাণসচিব সহ আধিকারিকরা পর্যন্ত সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। চিঠি পত্রেরও উত্তর দেন না। রাজ্য সরকারের এই স্বৈরাচারী ও তুঘলকী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কর্মচারী স্বার্থে সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ধারাবাহিক প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলছে। বর্তমানের এই আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির মধ্যেও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচী রাজ্যের সমগ্র শ্রমিক, কর্মচারীদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে, যদিও সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কর্মচারীদের স্বার্থ তেমনভাবে সুরক্ষিত করেনি। এ যাবৎকাল যতগুলি বেতন কমিশন হয়েছে এবারের বেতন কমিশনে বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বনিম্ন। কমিশন ন্যূনতম বেতন ১৮ হাজার টাকা সুপারিশ করেছে কিন্তু জে সি এম স্টাফ সাইড (কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মূল সংগঠনগুলির নীতি-নির্ধারক বডি) তাদের মেমোরেন্ডামে ন্যূনতম বেতন দাবি করেছে ২৬ হাজার টাকা। স্টাফ সাইড পে-কমিশন কার্যকরী করার দাবি করেছে ২০১৪ সাল থেকে। কিন্তু সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ করেছে ২০১৬ সাল থেকে। কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, বীমা, প্রতিরক্ষা, রেল সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী সংগঠনগুলি যৌথভাবে আন্দোলন-ধর্মঘটের কর্মসূচী নিতে চলেছে। আমাদের ক্ষেত্রে গত ২৩ নভেম্বর রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে আমরা পত্র দিয়েছি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্যে ২৪ নভেম্বর '১৫ প্রতিটি অফিসে অফিসে টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভের কর্মসূচী সংগঠিত করা হয়েছে। বিক্ষোভ সভাগুলিতে কর্মচারীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী অক্টোবরে পে-কমিশন গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেননি। অবশেষে ২৭ নভেম্বর পে-কমিশন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠিত হলেও তার বিচার্য বিষয় পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শুধু তাই নয় বর্তমান রাজ্য সরকার কার্যত নীতিগতভাবে স্থায়ী পদে অস্থায়ীভাবে চুক্তির ভিত্তিতে যে বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন পদে কর্মচারী নিয়োগ করেছেন তাদের চাকরির ব্যাপারে বুনিয়াদী কোনো শর্ত ন্যূনতম বেতন, ছেদহীন কাজ, নিয়মিত বেতনবৃদ্ধি, ছুটি, মহিলা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। তাই এদের দাবিকেও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলি ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ে (Terms of Reference) অন্তর্ভুক্তির জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্থ বিভাগের প্রধান সচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বকেয়া মহার্ঘভাতাজনিত কারণে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের বিপুল ফারাক এবং বেতন কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান কমানোর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ২৫ শতাংশ অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফ (Interim Relief) (ন্যূনতম ২০০০ টাকা) প্রদানের জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দাবি জানানো হয়েছে। মহার্ঘভাতা সহ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্যান্য আর্থিক দাবি নিষ্পত্তির প্রশ্নে রাজ্য সরকার অজুহাত হিসাবে তারস্বরে বকেয়া ঋণের বোঝা অবিশ্রাম উচ্চারণ করলেও রাজ্য সরকার কার্যত বেতন সঙ্কোচনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাই সর্বাংশের কর্মচারীদের আর্থিক দাবি অমীমাংসিত থাকলেও খেলা, মেলা, উৎসব, উপঢৌকন ও দান-খয়রাতির জন্য কোটি কোটি টাকা ওড়াতে সরকারের কোনো দ্বিধা নেই। তাই উপরোক্ত এই দুটি দাবিসহ কর্মচারীদের আরও তিন দফা দাবিকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্য জুড়ে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তারই ফলশ্রুতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের এই কেন্দ্রীয় সমাবেশ। কর্মচারী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হল পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া, অনুকূল পরিবেশ ছাড়া কর্মচারীদের কোনো বুনিয়াদী দাবিই মেটেনি। তাই সকল ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস উপেক্ষা করে জীবন-যন্ত্রণা, বঞ্চনা-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির জন্য অকুতোভয় সাহস, দুর্বার মনোবল আর নিটুট আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আগামী দিনে আমাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তাই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে এই সমাবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তনের লড়াইতে সামিল হওয়ার জন্য পশ্চিমবাংলার সমগ্র কর্মচারী সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের শিক্ষা হল—অত্যাচারী শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ। তাই আসুন পশ্চিমবাংলায় অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত মানুষের যে দুর্নিবার সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার সঙ্গে পা মিলিয়ে বুনিয়াদী দাবি আদায়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হই।

দাবিসমূহ ঃ

১। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ে পঞ্চম বেতন কমিশনের ২য় ও ৩য় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত কর। সাথে সাথে বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রদানে দ্রুত উদ্যোগ নাও।

২। মূল বেতনের ২৫ শতাংশ (ন্যূনতম ২০০০ টাকা) ইন্টারিম রিলিফ প্রদান কর এবং বকেয়া ৫০ শতাংশ মহার্ঘভাতা সম্পূর্ণ মিটিয়ে দাও।

৩। চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয় আওতাভুক্ত কর।

৪। নীতিহীন ও প্রতিহিংসামূলক বদলী রদ কর।

৫। ধর্মঘট সহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুনিশ্চিত কর এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখো। □

প্লাবন দেখল কলকাতা

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে রাজ্যে গত সাড়ে চার বছরে সরকার পরিবর্তনের পর তৈরি হয়েছে নিদারুণ অস্থিরতা। একটি আগ্রাসী উদারনীতিবাদী ফ্যাসিস্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন। এই সময়কালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর বিরামহীন নিপীড়ন নামিয়ে এনেছে আক্রমণ সংগঠিত করেছে এই সরকার। পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র কেমন প্রসারিত হয়েছে, উন্নয়ন যজ্ঞ কেমন চলছে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে কর্মচারীর অভিজ্ঞতা।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ বলেন যে, এই সমাবেশ কোনো সাধারণ সমাবেশ নয়। আর্থিক ভাবে বঞ্চিত, গণতান্ত্রিক অধিকার হারিয়ে আমরা আজ পথে নামতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। ধর্মঘট করার অধিকার নেই। তারই বহিঃপ্রকাশ এই সুবিশাল সমাবেশ। পরিস্থিতির পরিবর্তন করার শপথ নিতে হবে এই সমাবেশ থেকে।

আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হয়েছে, ধর্মঘটের অধিকার হরণ করা হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার হরণ করা হয়েছে, আমরা যে অধিকার লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জন করেছিলাম, যা আজ হরণ করা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এই সমাবেশ।

এই সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে কর্মী সঙ্কোচন দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের একটা অংশকে ব্যবহার করে কর্মচারীদের ওপর দমন পীড়ন হয়রানীমূলক নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন এ ধরনের নীতি বহির্ভূত কাজ চলছে অন্যদিকে চলছে তীব্র আর্থিক বঞ্চনা।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজ্যের সর্ব বৃহৎ কর্মচারী সংগঠন। এত আক্রমণেও সংগঠন ভীত হয়নি, বা পিছিয়ে থাকেনি। প্রতিদিন প্রতি মূহূর্তে আমরা লড়াই সংগ্রামের মধ্যে থেকেছি। এর জন্য সংগঠনকে অনেক ক্ষতিও সহ্য করতে হয়েছে। অনেক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে ব্লক স্তর, ইউনিট স্তরের নেতৃত্বকে দূর দূরান্তে বদলী করে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিনিয়ত আক্রমণের শিকার হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। এই কেন্দ্রীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অফিসে, জেলায় জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। জেলায় জেলায় প্রতিটি ব্লকে সাহসিকতার সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে বাঁচিয়ে রেখে আরো শক্তিশালী করছেন আমাদের লড়াকু সদস্য নেতৃত্বরা। তাই আক্রমণ নেমে আসতে পারে এ জেনেও আজ এই সমাবেশে কর্মচারীরা জমায়েত হয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে আমরা ধর্মঘট করেছি। অনেক আক্রমণ এসেছে। এই সরকার কোনো নিয়ম মানে না। বিচার ব্যবস্থা মানে না। একটা লুম্পেন বাহিনী সমস্ত সরকারের দখল নিয়েছে। এরকম একটা হিংস্র সরকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কর্মচারী সমাজ এই সময়কালে তিনটি ধর্মঘট করেছে। একদিনের মাইনে কাটা, চাকরি কাল থেকে একদিন কেটে নেওয়া ও প্রতিহিংসামূলক বদলির ভয়কে উপেক্ষা করে অকুতোভয় কর্মচারী সমাজ ধর্মঘটে শামিল হয়েছে।

কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবি একটাও পূরণ হয়নি, উলটে আমাদের অর্জিত দাবিগুলো একটা একটা করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন এই পরিস্থিতি থাকলে কর্মচারীর কোনো দাবি পূরণ হবে না। রাজ্যে গণতন্ত্র আজ লুণ্ঠিত। তাই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লড়াই হচ্ছে আজ আমাদের প্রধান কাজ। সেই লক্ষ্যেই আজ এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তার অনুগামীদের এক সময় বলেছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দিতে। এই সমাবেশ প্রমাণ করে দিয়েছে তার সেই ইচ্ছা পূরণ কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির শক্তি এই সময়কালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমাদের চাপে বেতন কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। টার্মস অফ রেফারেন্সে আছে ছ'মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনো বেতন কমিশনের কাজের জন্য কোনো ঘর বাড়িই দেওয়া হয়নি। ঘোষণার পর বেতন কমিশনের তিন মাস অতিক্রান্ত। তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বেতন কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট মূল বেতনের ওপর ২৫ শতাংশ অন্তর্বর্তী ভাতা (ইন্টারিম রিলিফ) প্রদানের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। এর ন্যূনতম রাশি হবে দু'হাজার টাকা। এছাড়াও চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন কমিশনের আওতাভুক্ত করার দাবি রেখেছে। চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের কৃতদাসে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের কোনো কাজের সময় নির্দিষ্ট নেই। স্বল্প মাইনেতে এদের কাজ করতে হচ্ছে। এদের কোনো সামাজিক নিরাপত্তা নেই। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের ষাট বছর চাকরির সার্কুলার জারি করেছিল। তিন বছর অন্তর ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট, ষাট বছর হয়ে গেলে অবসরের সময় এক লক্ষ টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করেছিল। এই সরকার এসে এই সব সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিয়েছে। এখন প্রতি বছর চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের রিনিউ করতে হচ্ছে। আজ স্থায়ী কর্মচারীরা অবসরের ফলে সংখ্যায় কমছে। স্থায়ী নিয়োগ হচ্ছে না। ফলে এই চুক্তি প্রথায় কর্মচারীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। ডায়েড-ইন-হারনেস প্রথায় যারা চাকরি পাচ্ছেন তাদেরও চুক্তি প্রথায় নিয়োগ করা হচ্ছে।

আজ যখন কর্মচারী সমাজ সব দিক থেকে আক্রান্ত, যখন সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তখন আমাদের সম্মিলিত ভাবে জনগণের লড়াইয়ে শামিল হতে হবে। আগামী দিনের যে কঠিন সংগ্রাম অপেক্ষা করছে তাতে আমাদের সমবেত প্রয়াস সমর্পিত হবে, যদি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, কর্মচারী সমাজের মুক্তি নেই, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুক্তি নেই। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে সমস্ত কর্মচারী সমাজ এই সমাবেশ থেকে শপথ নিয়ে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হবে।

এই সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র তাঁর বক্তব্য রাখেন (সম্পূর্ণ বক্তব্য এই সংখ্যার ৫ ও ৬ পাতায় মুদ্রিত হয়েছে)।

সভা পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র ও সহ-সভাপতি ত্রয় চুনীলাল মুখার্জী, চন্দন ঘোষ এবং কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

চা বাগান শ্রমিকদের পাশে

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

আকারে জানানো হয়েছে। ২৮ তারিখ রানী রাসমনি রোডে যে কেন্দ্রীয় জমায়েত অনুষ্ঠিত হবে তাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১২০০ কর্মচারী অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এই সভায় বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, অসিত ভট্টাচার্য। তিনি বলেন এই দান একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করলো। চা শিল্পের শ্রমিকদের পাশে আপনারা দাঁড়িয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালের আগে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার বলে কিছু ছিল না, একটা দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতি বিরাজ করতো। তার বিরুদ্ধে লড়াই করে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া সেই অধিকারগুলি আবার একে একে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীদের উপর অন্যায় বদলী থেকে শুরু করে নানা প্রকার আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। দেশে বর্তমানে যে অর্থনীতি কায়েম করা হয়ছে তার প্রভাবে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পে নেমে এসেছে অন্ধকার। একেবারে ছিবড়ে করে দেওয়া হচ্ছে এই শিল্পকে। শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ এই শিল্পের মালিকগণ আত্মসাৎ করে তা বিদেশের বাজারে লগ্নি করছে, ফলে চা বাগানগুলিতে কোনো কাজ হচ্ছে না এবং শ্রমিকদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারগুলিও খর্ব হচ্ছে। অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় তাদের সামনে থাকছে না। রাজ্য সরকার শ্রেণীগতভাবে চায় না শ্রমিকশ্রেণী উপকৃত হোক। বর্তমান রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার— দুটিই একই দৃষ্টিভঙ্গীর সরকার। রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর 'রেড ব্যাঙ্ক' চা বাগান অধিগ্রহণ করা সত্ত্বেও তারা শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য কিছুই করেনি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সরকারী অবহেলা যাই ঘটুক না কেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগ্রামী ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিয়ে এই জেলার সকল কর্মচারী যে ভূমিকা পালন করেছেন তার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সকল কর্মচারীকে পুনরায় সংগ্রামী অভিনন্দন জানান এবং আগামী ২৮ তারিখের জমায়েতকে সফল করার আহ্বান জানান।

এরপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ তার বক্তব্যে বলেন—আজ সারা বিশ্বের চেহারাটা যা দাঁড়িয়েছে তা পুঁজিবাদের দ্বারা শোষণের পরিণতি। বর্তমানে বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের একটা রূপ। এর বর্তমান ভাবনা তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টা। একটা সময় ছিল যখন পুঁজিবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে কিছুটা সহায়তা দিত নিজেদের স্বার্থেই। বর্তমানে স্থায়ী চরিত্রের কর্মচারীকে সরিয়ে দিয়ে চুক্তি প্রথার কর্মচারী নিয়োগ চলছে। আমরা স্থায়ী কর্মচারীরা মূলত ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। চা বাগানের শ্রমিকদের খাদ্য নেই, চিকিৎসা নেই, নিরাপত্তা বলে কিছু নেই— এই দূরবস্থার মধ্যে তাঁদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কর্মচারীদের তিনি অভিনন্দন জানান।

তিনি ঘোষণা করেন তালচিনি ব্লকের চা বাগান শ্রমিকদের ১০০০ পরিবারকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটি টীম উত্তরবঙ্গে যাবে এবং সেখানে ২৬টি দলের যৌথ যে সংগঠন চা শ্রমিকদের সাহায্যার্থে গঠিত হয়েছে তাদের সহায়তায় পরিবারগুলির হাতে সাহায্য তুলে দেওয়া হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সাহায্য চা শ্রমিক পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে এবং রানী রাসমনির জমায়েতকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংগঠনের বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকেও যথাক্রমে ১ লক্ষ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা ২৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সমাবেশের মঞ্চে সাধারণ সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। □

সুগত দাস

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 9th Issue, January 2016

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

রাজ্য সরকার ও বেতন কমিশনের কাছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয় সম্পর্কে

ক্রমিক নং ঃ কো-অর্ডি-০৩/১৬ তারিখ ঃ ১১/০১/২০১৬

মাননীয় প্রধান সচিব
অর্থ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাদের সুপারিশ পেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করেছে। একই সঙ্গে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয় নির্দিষ্ট করে সরকারী আদেশনামাও প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে ৫ম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ যা অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটির সুপারিশ হিসাবে গণ্য—যেগুলি এখনও রাজ্য সরকার রূপায়িত করেনি, সেগুলিকে বিচার্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

বস্তুত সাম্প্রতিক অতীতে পূর্ববর্তী বেতন কমিশনের অসঙ্গতি বা অমীমাংসিত বিষয়গুলি পরবর্তী বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে আওতাভুক্ত করে তৎকালীন রাজ্য সরকার এক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন এবং কর্মচারীদের চাকরিজীবনে উদ্ভূত সমস্যাবলীর নিষ্পত্তিবিধানে উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করেছেন।

তদুপরি, বর্তমানে রাজ্য সরকার স্থায়ী পদে নিয়মিত নিযুক্তির পরিবর্তে কার্যত নীতিগতভাবে চুক্তি প্রথায় কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছে এবং বর্তমানে লক্ষাধিক কর্মচারী রাজ্য সরকারী দপ্তরে বিভিন্ন স্তরে যুক্ত আছেন। তাদের কজের পরিবেশ, ন্যূনতম বেতন, ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির ব্যাপারে কোনো আদর্শ বিধি নেই।

এমত পরিস্থিতিতে আপনার কাছে আমাদের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ হলো ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে ৫ম বেতন কমিশনের কর্মচারী স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের সুপারিশ (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটির) সমূহকে অন্তর্ভূক্ত করা হোক এবং সেই মর্মে বিচার্য বিষয়ের (Terms of Reference) সংশোধন করা হোক। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ বিবেচনার জন্য তা বিচার্য বিষয়ের মধ্যে যুক্ত করা হোক।

আশাকরি, বিপুল অংশের কর্মচারীদের অপেক্ষমান দাবিগুলির সুমীমাংসা এবং চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের দাবিসমূহের সুষ্ঠু নিষ্পত্তির জন্য আপনি বিষয়গুলি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ভবদীয়
(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ইন্টারিম রিলিফ-এর সুপারিশ প্রসঙ্গে

ক্রমিক নং ঃ কো-অর্ডি-০৪/১৬ তারিখ ঃ ১১/০১/২০১৬

মাননীয় চেয়ারম্যান
ষষ্ঠ বেতন কমিশন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য গঠিত সপ্তম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাদের সুপারিশ পেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করেছেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপাতত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আপনার নজরে আনতে চাই।

আপনি হয়তো জানেন বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও মহার্ঘভাতার প্রশ্নে অতীতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্যাটার্ন (pattern) নীতিগতভাবে অনুসরণ করতেন এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে (সর্বনিম্নস্তরে কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন, উন্নততর বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগসমূহ) রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অবস্থান ছিল কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে উন্নততর।

বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ মহার্ঘভাতা কম পাচ্ছেন। জানুয়ারী, ২০১৬ মাস থেকে ১০ (দশ) শতাংশ মহার্ঘভাতা বরাদ্দ হলেও বকেয়ার পরিমাণ রয়ে যাচ্ছে ৪৪ (চুয়াল্লিশ) শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত অন্ততঃ ৬ (ছয়) শতাংশ মহার্ঘভাতা ধরে নিলে ১লা জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ব্যবধান দাঁড়ায় ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ যা মূল বেতনের (বেতন + গ্রেড পে) অর্ধেক। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ফারাক কার্যত বিপুল। রাজ্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রদানের আগে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ রূপায়িত হলে এই ফারাক আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এমত পরিস্থিতিতে আপনার নিকট আমাদের সুনির্দিষ্ট দাবি হল ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্তকরন ও কার্যকরী করা সাপেক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ ইন্টারিম রিলিফ (Interim Relief), ন্যূনতম ২০০০ টাকা, অবিলম্বে সুপারিশ করা হোক।

আশাকরি, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রস্ফীতির চাপে জর্জরিত কর্মচারী সমাজের বিপুল বঞ্চনার কথা মাথায় রেখে আপনি ষষ্ঠ বেতন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে বিষয়টি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবেন।

ভবদীয়
(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

দুর্দশাগ্রস্ত চা বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুরা

অনাহারক্লিষ্ট, অসহনীয় নৈরাজ্যের শিকার চা বাগান শ্রমিক পরিবারের পাশে থাকার সঙ্কল্প নিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ-র হাতে তুলে দেন জেলা শাখার সম্পাদক তাপস বসু। এই

সাধারণ সম্পাদকের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সম্পাদক তাপস বসু

কমিটির আহ্বানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে সংগঠনের জেলা শাখার উদ্যোগে ঐ জেলার সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে ১০ টাকার কুপনে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। গত ২০ জানুয়ারি ২০১৬ জেলার সংগঠন দপ্তরে কর্মচারী জমায়েতের মধ্য দিয়ে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকার একটি চেক সভায় মনোজ কান্তি গুহ সহ যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য, ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্ব ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শাখার স্থায়ী সভাপতি বাসুদেব সাহা এই সভা পরিচালনা করেন। সভার শুরুতে অনাহারে মৃত চা বাগান শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে নীরবতা পালন করা হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক তাপস বসু। এই অল্প সময়ে ১ লক্ষের অধিক টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্মচারী সমাজ মানবিক আবেদনে যে বিপুল সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য তিনি জেলার সকল সরকারী কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

তিনি আশা প্রকাশ করেন তাদের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় তারা পৌঁছোতে পারবেন। এই জেলায় শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মী নেতৃত্বদের উপর আক্রমণের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন—এই জেলার ৫ জন নেতৃত্বকে অন্যায় ভাবে জেল খাটতে হয়েছে। কাকদ্বীপের কো-অর্ডিনেশন দপ্তর একাধিকবার লুঠ হয়েছে, সব কিছু ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ জেলা জমায়েতের পোস্টার লাগানো হয়েছিল

সাধারণ সম্পাদকের হাতে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন বর্ধমানের সম্পাদক বিশ্বনাথ দে

সাধারণ সম্পাদকের হাতে ৬০ হাজার টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুরের সম্পাদক গোবিন্দ চক্রবর্তী

কাকদ্বীপ ব্লকে। সেই কর্মসূচী হয়ে যাওয়ার ২১ দিন পর সেই ঘটনার জেরে কাকদ্বীপ মহকুমা সম্পাদক কালিপদ দাস আক্রান্ত হয়েছেন। এই আক্রমণের কথা সাথে সাথেই উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে অভিযোগ

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।